কল্যাণী

আশাপূর্ণা দেবী

মহেন্দ্র পুস্তক ভবন
২৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

—তিন টাকা মাত্র—

১৩৫৭

শ্রীমতী আরতি দেবী কর্ত্তৃক ৮-এ মারহাট্টা ডিচ লেন হইতে প্রকাশিত ও
বিজয়কুমার মিত্র, কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ছবিকে দিলাম—

আশাদি

আমার অনেকদিন আগে প্রকাশিত 'অনির্ব্বাণ' নামক উপন্যাসখানি সম্প্রতি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয় 'কল্যাণী' নামে। রূপান্তরের সময় কিছু পরিবর্ত্তন ও বহু পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন হয়।

সেই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপটি 'কল্যাণী' নামেই প্রকাশিত হলো।

১০।৯।৫৪। লেখিকা

আঁচড়ানো চুলের ওপর আর একটা 'সমাপ্তিস্পর্শ' দিয়েই নিখিল উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলো—জগ, জগ, ওহে জগন্নাথবল্লভ! গেলে কোথায়?

দরজার কাছে একটি খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা আধাবয়সী মুখকে উঁকি মারতে দেখা গেলো।

—কি বলছেন কি?

প্রশ্নটাতে যে খুব বেশী নম্রতা প্রকাশ পেলো এমন নয়। নিখিল ঘুরে দাঁড়িয়ে রাগতঃভাবে বলে—'কি বলছেন কি?' একেবারে মিলিটারী! আমার ঘড়ি কোথায় রেখেছিস হতভাগা? বেরোবার সময়ই যতো বিঘ্ন।

জগন্নাথ একটু ব্যঙ্গদৃষ্টিতে মনিবপুত্রের দিকে তাকিয়ে বলে—আজকাল বুঝি দু'কব্জিতে দুটো ঘড়ি বাঁধা রেওয়াজ হয়েছে দাদাবাবু?

নিখিল ভুরু কুঁচকে বলে—তার মানে?

—মানে---আপনার গিয়ে—একটা ঘড়িতো এ কব্জিতে বাঁধাই রয়েছে—

ডবল্‌কাফ শার্টের হাতাটা সরিয়ে দেখে নিয়ে নিজের বিভ্রমে নিজেই হেসে ওঠে নিখিল। তারপর বলে—আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। দেখ শোন্, আমি আজ আর তোর চা খাচ্ছি না, চায়ের নেমন্তন্ন আছে আমার।

—নেমন্তন্ন? জগন্নাথ দুই চোখ কপালে তুলে বলে—নেমন্তন্ন? আপনাকে আবার নেমন্তন্ন করলো কে?

নিখিলের হচ্ছে সেই বয়েস, আর বোধকরি সেইরকম অবস্থা, যখন শুধু অকারণ পুলকে হৈ হৈ করতে ইচ্ছে যায়, কথার জন্যই কথা কইতে ভালো লাগে। শ্রোতাটা উপলক্ষ্যমাত্র। তাই হঠাৎ একটি বীরোচিত

ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—তার মানে? কি ভাবিস তুই? আমি এমনই একটা হতভাগা যে কেউ নেমন্তন্নও করতে পারে না? আমার কতো ভালো ভালো বন্ধু আছে তা জানিস?

—তা আর জানিনা? জগন্নাথ গম্ভীরভাবে বলে—সেই সব ভালো ভালো বন্ধুদের দাপটে একজন মেম্বরের সংসারে মাসে দশ পাউণ্ড চা লাগছে—

—হুঁ, বড্ডো খোঁটা দেওয়া হচ্ছে! বেশতো তুইও শোধ নে! তোর দেশোয়ালী ভাইদের এনে তিন বেলা চা খাওয়া!

—আমার দরকার নেই! বাড়ীতে একটা বৌ এলে তবে ওই বন্ধুরা জব্দ হয়!

নিখিল কটাক্ষপাতের সঙ্গে হেসে বলে—হুঁ! খুব কথা শিখেছিস? রোস্, তোকে জব্দ করতেই একটা বৌ…এই সেরেছে! কে কড়া নাড়ছে? দেখগে যা কে এলো!

কথার সঙ্গে সঙ্গে কড়া নাড়ার শব্দ উদ্দাম হয়ে ওঠে। জগ ক্রুদ্ধভাবে বলে—আর কে? আপনার সেই "ভালো ভালো বন্ধুরা"!…যাই, বড়ো কেট্‌লীটা চুলোয় চাপিয়ে দিইগে। নেমন্তন্ন করবে বন্ধুরা! তাহলেই হয়েছে! 'নিয্যস' কোনো 'বান্ধুবী' জুটেছে।

শেষের কথাটা গলাখাটো করেই বলে বটে, কিন্তু কান বাঁচিয়ে বলেনা।

জগ নামতে নামতেই হুড়মুড় করে একটি দল বন্ধু এসে ঢোকে। বলা-বাহুল্য ঘরের আবহাওয়া আর শান্ত থাকে না। তারা প্রথমটা খালি খানিকটা হৈ হৈ করে নিয়ে তারপর বসে। একগোছা কার্ড হাতে করে এসেছে ওরা, কলেজের বার্ষিক উৎসব-অনুষ্ঠান হচ্ছে—তারই নিমন্ত্রণ কার্ড।

একজন বলে—কি? খবর কি? আকাশে উড়ছো না কি? কার্ড বিলি করবার কথাটা ছিলো কার?

নিখিল ইস্ করে উঠে বলে—একদম ভু'লে গিয়েছিলাম ভাই।

—তা যাবে বৈকি। এই নাও প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির কার্ড। তুমি যাবে।

—কেন? তোরা কেউ যা না?

একজন লাফিয়ে উঠে ভয়ের ভান করে বলে ওঠে—ওরে বাবা! প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি মানেই তো মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি! আমি অন্ততঃ নয়।

হৈ হৈ করে হাসির রব ওঠে।

নিখিল বলে—আচ্ছা আমি যাবো, কিন্তু আমাকে—খানচারেক কার্ড দে দিকিন!

—চারখানা? কেন, অতো কি করবি?

—আছে দরকার।

মৃদু হেসে থামে নিখিল।

—দরকারটা যেন রহস্যময় লাগছে নিখিলচন্দ্র! ব্যাপার কি?

—ব্যাপার আবার কি? পাবো কিনা তাই বল?

—এই নাও অভিমানিনী বালিকা!·· বন্ধু চারখানা কার্ড বার করে নিখিলের সামনে রেখে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো. ঠিক এই সময় জগন্নাথ ঢুকলো চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বন্ধু একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলো —আরে! একি? মেঘ না চাইতেই গরম জল! বাপ জগন্নাথবল্লভ, এ আদেশ কে দিলো তোমায়?

জগন্নাথ কাঁধের তোয়ালেখানা কাঁধ থেকে নামিয়ে পেয়ালাগুলো মুছতে মুছতে বলে—আজ্ঞে সরকারি আদেশ দেওয়াই আছে!

চায়ের শেষে বন্ধুরা নিখিলকেও টানতে টানতে বার করে নিয়ে যায়, আর জগন্নাথ বিরক্ত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

পথে বেরিয়ে ওরা বলে—নিখিল, প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির কার্ড তোমার কাছে আছে?

—হাঁ হাঁ ঠিক আছে, বলে নিখিল চলতে সুরু করে প্রফেসরের বাড়ীর ব্যাপারটাই আগে সারা ভালো।

নিখিলকে আবার দেখা গেল পরদিন সকালে। ভবানীপুরে একখানি মাঝারি গোছের তেতালা বাড়ীর সামনে। বাইরের ঘরে ঢুকেই চেয়ারে উপবিষ্ট গৃহকর্ত্তাকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে—মেসোমশাই, নেমন্তন্ন করতে এলাম। এই নিন কার্ড। আমাদের কলেজে—আমারও পার্ট আছে, যেতে হবে!

গৃহকর্ত্তা সুরেশবাবু নিজের নথীপত্রের মধ্যে ডুবেছিলেন, এই আকস্মিক 'হানায়' বিব্রতভাবে বলেন—যেতে হবে? আমাকে? আমি আর তোমাদের ওসব নাচগান থিয়েটার-ফিয়েটার কি বুঝবো বাবা? সময় বা কোথা? তার চেয়ে বরং তোমার মাসীমাকে বলে দেখো যদি যান।

নিখিল উৎফুল্ল ভাবে বলে—যদি-টদি নয়, সক্কলকেই যেতে হবে, চারজনের আলাদা আলাদা কার্ড এনেছি। যাবেন নিশ্চয়।···যাই মাসীমাকে বলিগে।

বলে ভিতরের দিকে স্বচ্ছন্দগতিতে ঢুকে যায়।

দালানে ঢুকতেই সামনে একটি বছর দশেকের ছেলে ওর হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে বলে—এই যে নিখিলদা' আজ আসা হলো? কাল এলেন না যে বড়ো?

বলতে বলতে টেনে নিয়ে যায় সামনের ঘরের দিকে।

নিখিল বিব্রতভাবে বলে—কেন, কাল কি ছিলো বলো তো মল্লিনাথ?

ঘরের মধ্যে একখানি ডুরেশাড়ীর আঁচলের আভাস দেখা যায়। বোধকরি তাতে একটু চাঞ্চল্যেরও আভাস।

মল্লিনাথ বলে—ও গড্‌! আপনি একেবারে ভুলেই বসে আছেন? দিদি এদিকে—

সহসা ঘরের ভিতর থেকে ডুরে শাড়ী বেরিয়ে আসে প্রায় বিদ্যুতবেগে। মল্লিনাথের দিকে কোপকটাক্ষপাতে বলে—আঃ মল্লি!

মল্লিনাথ এ ইসারা গ্রাহ্য করে না, গড়গড় করে বলে যায়—পর্শুদিনকে দিদি আপনাকে চায়ের নেমন্তন্ন করে রাখেনি? তবু ভাগ্যিস মাকে বলা হয়নি। মা হলে রেগে একেবারে কুরুক্ষেত্র করতেন। দিদি তো—আপনি 'আসবেন' 'আসবেন' ক'রে রাত্তির অবধি বসে থেকে শেষ পর্য্যন্ত—

নিখিল চকিতে লজ্জাবিমূঢ়া কিশোরীটির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—শেষ পর্য্যন্ত 'দিদি' আমার ভাগের চা আর খাবারগুলো খেয়ে ফেললো, কেমন? ঠিক বলেছি তো?

মল্লিনাথের দিদি যতোই 'নিসপিস' করতে থাকে, মল্লিনাথ ততোই সজোরে প্রতিবাদ করে—ঠিক বলেছেন না কচু বলেছেন! শেষ পর্য্যন্ত দিদি রাগ করে রাত্তিরে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো।

দিদি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—মল্লি, ফের? ফের ওইরকম বাজে কথা?

—বাজে কথা? কাল রাত্তিরে খেয়েছিলি তুই?

মণি বলে ওঠে—সে আমার খিদে ছিলোনা বলে!

মল্লিনাথ ভালোমানুষের মত বলে—তাই তো বলছি—রাগের চোটে খিদে চলে গেলো! নয়তো শুধু শুধু কখনো মানুষের খিদে চলে যেতে পারে? বলুন? আমার তো মাঝ-রাত্তিরে উঠেও খিদে পায়!

নিখিল মল্লিনাথের পিঠ ঠুকে দিয়ে বলে—চমৎকার! এই তো ঠিক! তা'হলে দিদি কাল আমাকে খুব গালমন্দ করেছিল, কি বলো মল্লিনাথ?

মণি ভুরু কুঁচকে প্রতিবাদ করে ওঠে—আঃ! কী অদ্ভুত কথা হচ্ছে? আপনি কাজের মানুষ, আসতে যদি না পারেন! জোর তো কিছু নেই।

নিখিল মৃদুহেসে বলে—কে বললে জোর নেই? খু—ব আছে।

—ছাই আছে!

মল্লিনাথ ইত্যবসরে নিখিলের হাত থেকে কার্ড টেনে নিয়েছে—দেখি দেখি এটা কি ব্যাপার! বারে—সবাইয়ের আলাদা কার্ড? বাবার, মার, আমার, দিদির! আমরাও যাবো নিখিলবাবু?

নিখিল বলে ওঠে—নিশ্চয়! সকলে যাবে বলেই তো—তুমি, মাসীমা, তর্কচূড়ামণি সবাই যাবে।

—দিদি যাবে? হুঁঃ! তা'হলেই হয়েছে! মা যেতে দিলে তো!

—বাঃ মাসীমাও যাবেন।

মল্লিনাথ হতাশার অভিনয় করে বলে—মা? মা কি করে যাবেন? আজ সন্ধ্যেবেলা যে মার পাকাদেখা!

নিখিল স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলে—মার পাকাদেখা!!

কিশোরীটি বিরক্ত ব্যাকুল ভাবে বলে—আঃ এতো বোকার মত কথা বলিস!…মার সইয়ের মেয়ের পাকাদেখা।…ওই যে আসছেন মা—

তরুবালাকে প্রণাম ক'রে নিখিল বলে—কি মাসীমা, আজই আপনার সইয়ের মেয়ের পাকাদেখা পড়লো?

তরুবালা ভারিক্কিচালে বলেন—কেন, আজ কি?

মল্লিনাথ শশব্যস্তে বলে ওঠে—নিখিলবাবুর কলেজের বার্ষিক উৎসব-অনুষ্ঠান, নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। বাবার, তোমার, দিদির, আমার, সকলের নেমন্তন্ন।…বাবার কথা বাদ দাও, তোমার তো ওই সইয়ের মেয়ে, বাকী রইলাম কুল্লে—দিদি, আর আমি!…যা দেখছি, এই ছেলেমানুষ দু'জনকেই একলা যেতে হবে আর কি!

নিখিল যেন মর্ম্মাহত হয়ে গেছে এমনভাবে বলে—আপনি যাবেন না

মাসীমা ?···আমি কতো আশা করেছিলাম, যাবেন—আমাদের কীর্ত্তিকলাপ দেখবেন। গাড়ী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছি—

তরুবালা ঈষৎ প্রসন্নভাবে বলেন—তা' কি করবো বাপু, বেছে বেছে আজকেই তোমার ঘটা! কাল হলে বরং—

মল্লিনাথ তাড়াতাড়ি বলে—কাল হ'লে কি হতো সে কথা থাকগে, যাক মা।···নিখিলবাবু আপনি গাড়ী পাঠাবেন। দিদি আর আমি ঠিক যাবো।··· দিদি, তুই যেন আবার শাড়ী পরতেই সময় কাবার করে দিসনি।

তরুবালা ছেলের দিকে রুষ্টদৃষ্টিতে চেয়ে বলেন—তুমি যাবে যেও, দিদি আবার কলেজে-ফলেজে কোথায় যাবে ?

নিখিল বলে—সে কি মাসীমা! এতে আবার কলেজের কি দোষ হলো ? একটা বিচিত্রানুষ্ঠান হবে, প্রফেসরদের স্ত্রীরা, তা'পর ষ্টুডেণ্টদের বাড়ী থেকে মহিলারা অনেকেই আসবেন! আপনি যেতে পারবেন না—এইটাই বড় দুঃখের কথা হচ্ছে!···তা'হলে গাড়ী আসবে, মল্লিদের পাঠিয়ে দেবেন ?

তরুবালা চক্ষুলজ্জার দায়ে ইতস্ততঃ করে বলেন—তাই তো বাপু, আমি না হয় বললাম—আচ্ছা পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু উনি কি বলবেন তা'তো বুঝতে পারছি না—

মল্লিনাথ দুই হাত উল্টে গম্ভীরভাবে বলে—এর আর বোঝাবুঝির কি আছে ? বাবা আবার অন্য কি বলবেন ? তুমি যা বলবে, তাই বলবেন!

নিখিল ও মল্লির দিদি মণি মুখ ফিরিয়ে হাসে। তরুবালা ছেলেকে পরে হাতে পেলে কি করবেন তাই ভেবে নিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বলেন—"আমার কথা নিয়েই তোমরা চলছো যে"—বলে চলে যান।

দু'জোড়া চোখের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়।

তরুবালা চোখের আড়াল হতেই মল্লিনাথ দুষ্টু হাসি হেসে বলে—দেখলি তো দিদি, কায়দা করে কেমন তোর যাওয়াটা পাকা করে নিলাম। যাচ্ছিলো ভেস্তে।

মণি লজ্জিত ক্রুদ্ধভাবে ছোটভাইয়ের একটা কান ধরে বলে—ভারী ইয়ার হয়েছো তুমি, অসভ্য ছেলে!

—আহা-হা ওকি? নিখিল ওকে কাছে টেনে নেয়—একি অত্যাচার। দেখছো মল্লি, ভালো করতে গেলে কানমলা খেতে হয়—এই হচ্ছে এযুগের রীতি। বেশ মণি, তোমার যদি আমাদের অভিনয় দেখতে এতোই খারাপ লাগে, যেওনা! মল্লি একাই একশো! কি বলো মল্লি?

মণি ভ্রূভঙ্গী করে বলে ওঠে—না যাবে না বৈকি! যা অপূর্ব্ব অভিনয় হবে বুঝতেই পারছি, সমালোচনার জন্যেও তো দর্শকের দরকার। কি অভিনয় হবে শুনি?

—কার্ডে লেখাই আছে।

—ও! 'শেষ রক্ষা'! নিজে কি হবেন শুনি? চন্দরদা' বুঝি?

নিখিল উদাস মুখে বলে—চন্দরদা' সাজবার আলাদা লোক আছে। আমার ভূমিকা হচ্ছে—গদাইয়ের!

খিল খিল করে হেসে ওঠে মণি।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে তরুবালার ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া যায়—মণি, পানগুলো সাজা হয়েছে, না পড়ে আছে?

মণি ম্লানমুখে সরে যায়।

ফেরার সময় সুরেশবাবু সস্নেহে বলেন—নিখিল চললে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! প্রফেসর চ্যাটার্জ্জির বাড়ী যেতে হবে একবার।

—ওঃ! তা' দেশের খবর সব ভালো? বাবা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ! এই ফাঙ্‌শানটা হয়ে গেলেই একবার দেশে যাবো।

—বেশ! বেশ! আমার একবার তোমার বাবার—ওই কি বলে—আশ্রমটি দেখতে যাবার ইচ্ছে হয়! সময় হয়ে ওঠে না। বেশ আছেন তোমার বাবা! শহরের এই কোলাহলে এক এক সময়ে প্রাণ যেন—ইয়ে কি বলে—হাঁপিয়ে ওঠে।

নিখিল বিনীতভাবে বলে—বেশ তো চলুন না একবার। মিসেস চ্যাটার্জ্জি তো ধরেছেন—ইয়ে মানে বলেছেন—এবারে আমার সঙ্গে যাবেন!

—মিসেস চ্যাটার্জ্জি?

সুরেশবাবু চোখের চশমাটা খুলে নিখিলের মুখের দিকে তাকান।

নিখিল হাসি চেপে গম্ভীরভাবে বলে—হ্যাঁ বলছিলেন, গ্রামের সৌন্দর্য্য কখনো দেখেননি—তাই আমাদের দেশে যাবেন।···আচ্ছা চলি মেসোমশাই, যাবেন কিন্তু আমাদের কলেজে। গাড়ী পাঠাবো।

নিখিল কার্ড দিয়ে চলে যেতে প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি মিসেসের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধভাবে বলেন—আচ্ছা তুমি এমন অবুঝ কেন বলো তো? দেখছো নিখিলদের দেশে তোমার যাবার প্রস্তাবে নিখিল কেমন বিব্রত বোধ করছে। তবু তুমি—

কথায় বাধা দিয়ে প্রফেসর-পত্নী বলাকা দেবী বলেন—না দেখতে পাইনি। তোমার মত অতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই। নিখিল সাধারণ ভাবে আমার অসুবিধের দিকটাই দেখছিলো।

—তাই হবে। আচ্ছা—থাক্।

—তুমি যতোই আপত্তি করো, আমি যাবোই। কতোকাল ট্রেনে চড়িনি

তা ভাবতে পারো ? যাক তোমার মত লোকের স্ত্রী হবার দুর্ভাগ্য যার হয়েছে, তার অনেক অভাবনীয় বস্তুর সঙ্গেই পরিচয় হয়।···কিন্তু এমাসে কিছু বাড়তি টাকা আমার চাই।

—বাড়তি টাকা ?

—হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়লে যে! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে টাকা শব্দটার মানে জানো না। নিখিলের ওখানে যাবার আগে মার্কেটিং করতে হবে না আমাকে ? না কি ভিখিরীর হাল করে যাবো এই চাও ?

—এখন আর আমি কিছুই চাইনা বলাকা। আগে অবশ্য চাইতাম, তুমি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকো। যাক সে কথা।

এই ভাবেই দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেন এঁরা। দুটি অসম রুচি জীবকে এক খোঁটায় বেঁধে, একপাত্রে ঘাস জল দিয়ে পালন করতে চাইলে যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, সেই বিক্ষোভ এঁদের জীবনে।

কিন্তু এ বিক্ষোভ শুধুই কি চ্যাটার্জ্জি দম্পতির ?

ষ্টেশনে নেমে উৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে নিখিল যতটা না হতাশ হ'ল, অবাক হ'ল তার চাইতে বেশী। অন্য অন্য বারে—ট্রেনের গতি মন্থর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে বাবার হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন মুখখানি। আর চোখে পড়ে টিনের শেডের ওপারে পরিচিত সাইকেল-রিক্সখানির অপেক্ষমান ভঙ্গী। ট্রেণ আসবার নির্দ্দিষ্ট টাইমের অনেক আগেই যে নিখিলের অভ্যর্থনার আয়োজন প্রস্তুত হয়ে থাকে সেটা বেশ বোঝা যায়।

আর এইবারেই কিনা তিনি অনুপস্থিত ?

এমন কি গাড়ীখানা পর্য্যন্ত আসেনি ? অথচ এবারেই তার সঙ্গে সম্মানিত অতিথি। পরপর দু'খানা চিঠিতে সে মিসেস চ্যাটার্জ্জির আগমন সংবাদ দিয়েছে, এমন কি তাঁর রুচি প্রকৃতি অভ্যাস অনুরাগের তথ্য জানাতেও ত্রুটি করেনি, পাছে অভ্যর্থনার দোষ ঘটে।

পল্লীগ্রাম দেখার সখ যতই প্রবল হোক, অসুবিধা সহ্য করবার সৎসাহস যে শহুরে মহিলাদের বেশী থাকেনা, শহরে বাস করে এ বোধটুকু তার জন্মেছে।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি বা বলাকা দেবীকে যে সে নিজের ইচ্ছেয় নিমন্ত্রণ করে এনেছে এমন নয়, তাঁর অতি আগ্রহের ঠ্যালায় ভদ্রতার খাতিরেই মৌখিক আমন্ত্রণ করতে হয়েছে, না করে উপায় ছিল না বলেই, কিন্তু আদর-যত্নের ঘাটতি হয় এটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু বাবা করলেন কি ?

চিঠি পাননি ? দু-দু'খানা চিঠি মারা পড়বে এরই বা যুক্তিসঙ্গত কারণ কি থাকতে পারে ?

স্বাস্থ্যবান শক্তিমান তার পিতাকে কখনো অসুস্থ দেখেছে বলে মনে পড়ে না নিখিলের, তবু যদিই অসুখ-বিসুখ করে থাকে কিছু, আসা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে ওঠে, আশ্রমের আর কাউকেই কি পাঠানো চলতো না একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করে ?

ছোট গ্রাম, ছোট ষ্টেশন, ব্যবস্থাও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। টিনের শেড্ দেওয়া যে অল্প স্থানটুকু 'ষ্টেশন' নামের গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ধারে-কাছে যান-বাহনের চিহ্নমাত্র নেই।

বাংলার পল্লীগ্রামের দুঃখসহিষ্ণু লোক, ষ্টেশন এবং গ্রামের মধ্যবর্ত্তী পাঁচ-সাত মাইল রাস্তাকে বিরাট একটা কিছু মনে করেনা, গাড়ী পাল্কির প্রশ্ন কমই ওঠে। ভদ্রশ্রেণীর যাঁরা হাঁটতে অক্ষম, গ্রামের মধ্য থেকে পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ করে রাখেন পুষ্পকরথ—সভ্যযুগের প্রারম্ভে যে অপূর্ব্ব যান অবতীর্ণ হয়েছিল পৃথিবীতে।

সম্প্রতি যে দু'একখানা অতি আধুনিক সাইকেল-রিক্স নজরে পড়ে, সেটা—"মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমে"র নিজস্ব সম্পত্তি।

বাংলাদেশের অসংখ্য লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর একটী নাতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রম"।

নিখিলের বাবা বিভূতিবাবু এর প্রতিষ্ঠাতা।

নিখিল এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে—

—কি ব্যাপার! আশ্রম থেকে গাড়ী আসেনি যে! মুস্কিল হলো তো। আমার চিঠিটা পাননি না কি ?...তাই বা কি করে হয় ?...দু'দুটো চিঠি দিলাম!

বলাকা দেবী বলে ওঠেন—আমাদের ট্রেনটা বোধহয় অতি উৎসাহে "বিফোর টাইমে" এসে গেছে!

নিখিল হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললো—না তো, ট্রেন ঠিক সময়েই ইন্ করেছে! তাছাড়া আশ্রমের গাড়ী তো একঘণ্টা আগে থেকেই এসে বসে থাকে। বুঝতে পারছি না তো!

বলাকা দেবী অগ্রাহ্য ভরে বলেন—

এর মধ্যে আর না বোঝবার কি আছে? বোঝাই যাচ্ছে পাঠাতে ভুল হয়ে গেছে!

নিখিল বলে—ভুল হয়ে গেছে?...বাবার? অসম্ভব! আমি আসছি—সেকথা বাবা ভুলে যাবেন?

—ভুলে যে গেছেন, সেটাতো প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবা তো আর ভুল-ভ্রান্তির অতীত দেবতা-টেবতা নয়? অনেক কাজেই ব্যস্ত থাকেন, ষ্টেশনে গাড়ী পাঠানোর মতো তুচ্ছ কথাটা ভুলে যাওয়া এমন আর কি?

ক্ষুব্ধ নিখিল উত্তর দিলো—বাবাকে জানলে একথা বলতেন না! কিন্তু গাড়ী না আসা যে কি, সেটা টের পাবেন এক্ষুনি!

এদিক-ওদিক তাকিয়ে অগত্যা ষ্টেশনমাষ্টারের কাছে এসে বিব্রত ভঙ্গীতে বলে—ভারী তো মুস্কিল হলো মাষ্টারমশাই, আশ্রমের গাড়ী আসেনি!

ষ্টেশনমাষ্টার তাকিয়ে দেখে ব্যস্তভাবে বলেন—হঠাৎ এসে পড়েছেন বুঝি? খবর দেওয়া ছিলো না?

নিখিল বলে—ছিলো বৈ কি। বিশেষ করে দেওয়া ছিলো! ভাগ্যক্রমে এবারেই সঙ্গে একজন বিশিষ্ট আত্মীয়া রয়েছেন—

ষ্টেশন মাষ্টার এক পলক অদূরবর্ত্তিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে—ও তাই নাকি? তবে তো বড়ো মুস্কিল দেখছি। দেখুন একটা গরুর গাড়ী যদি—

শুনেই বলাকা দেবী বলে ওঠেন—গরুর গাড়ী ?…ওঃ মার্ভেলাস !…গরুর গাড়ীর এক্সপিরিয়েন্স তোমার আছে নিখিল ? আমার তো শুনে খুব খুশি লাগছে—

নিখিল বলে—অভিজ্ঞতাটা খুব খুশিকর হবে, এমন ভাববেন না ! তবু—পেলেও বাঁচা যায়।

ষ্টেশনমাষ্টার বলেন—আচ্ছা আমি কাউকে বলে দিচ্ছি গাড়ী দেখতে ! ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পেয়ে যাবেন নিশ্চয় !

বলাকা দেবী শিউরে ওঠেন—ঘণ্টা খা-নেক ! এতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ?

নিখিল তীক্ষ্ণ হেসে বলে—একটু ভুল করছেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি ! এদেশের চাষাভূষোদের সময়ের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায়না। একঘণ্টা মানে তিনঘণ্টা।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ কি জানেন ? এদের গতিহীন জীবনে একঘণ্টা আর তিন ঘণ্টার মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। জীবন ধারণের প্রত্যেকটি উপকরণের জন্যে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করতে করতে অপেক্ষা করাটাই এমন গা-সওয়া হয়ে গেছে যে ওতে আর কিছুতেই ধৈর্য্য হারায় না ! অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য আপনার যদি না থাকে, চলুন হাঁটা যাক ?

বলে ক্ষোভের হাসি হেসে এ্যাটাচী কেস দুটো দু'হাতে তুলে নিলে নিখিল।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি দুই চোখ কপালে তুলে শিউরে উঠলেন—বলো কি নিখিল, হাঁটতে হবে ? কতোটা রাস্তা ?

—তা' মাইল পাঁচ-সাত কোন্ না হবে !

দূরত্ব সমুদ্রের বহর শুনে বলাকা দেবী হাঁটার প্রস্তাবটা নেহাৎ পরিহাস ভেবেই বালিকার মতো হেসে ওঠেন।

নিখিল গম্ভীর ভাবে বলে—হাসছেন যে? অপেক্ষা করতেও পারবেন না, হাঁটতেও পারবেন না, করবেন কি শুনি?

—তাই বলে পাঁচ-সাত মাইল? হি-হি-হি।

নিখিল আরো গম্ভীর হয়ে বলে—কেন অন্যায় কি বলেছি? প্রত্যেক বিষয়েই তো আপনারা পুরুষের সমকক্ষ হবার দাবী তুলছেন, খাটবার বেলাতেই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন?

—মাথা খাটানোর কাজে পুরুষের সঙ্গে অবশ্যই সমান হবো। তাই বলে হাত-পা খাটানো! কি অদ্ভুত কথা!

নিখিল জোর দিয়ে বলে ওঠে—কিছু অদ্ভুত কথা নয়। যতোদিন না আপনারা হাত-পা খাটানোর কাজেও পুরুষের সঙ্গে সমান হতে পারবেন, ততোদিন আর সমকক্ষতার বড়াই করবেন না।···আচ্ছা এখন তর্ক থাক, দেখি কে যেন আসছে—বোধহয়—

—আর দেখায় কাজ নেই, তার চাইতে তুমি ফেরবার টিকিট কাটো দিকিন।

—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর ফেরবার গাড়ী নেই।

—এই রকম ব্যবস্থা যেখানে, সেক্ষেত্রে যে কি করে তোমার বাবা গাড়ী রাখবার কথা ভুলে গেলেন এই আশ্চর্য্য। অদ্ভুত দায়িত্বজ্ঞান কিন্তু!

বলাকা দেবী ঝিলিক মেরে ওঠেন।

আহত নিখিল একটা কি উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—নিশ্চয়ই তিনি অসুস্থ, না হ'লে এরকম ঘটনা সম্ভব নয়।

বলাকা দেবী অবশ্য অনেক সময় অনেক আলাপ আলোচনায় নিখিলের পিতার উপর সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে এসেছেন, তবু তর্কের লোভ সামলাতে পারেন না।

মুচকে হেসে বলেন—হতে পারে তিনি অসুস্থ, কিন্তু গাড়ী পাঠাতে নিশ্চয়ই পারতেন। উচিত ছিল না কি পারা? একজন ভদ্রমহিলা যে তাঁদের দেশের মেয়েদের মত বিশক্রোশ রাস্তা ভাঙতে পারে না এটা অবশ্যই বিবেচনা করবার মত কথা। নাকি আমার আসার কথা জানাওনি তাঁকে?

নিখিল শুষ্ক মুখে ঘাড নাড়ে।

জানায়নি এতবড় মিথ্যা কথাটাই বা বলে কোন মুখে?

অকারণে বাবা এরকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেবেন সে অসম্ভব। আছে কোন বিশিষ্ট কারণ, নয় তো দৈব-দুর্ব্বিপাক! নিজে একলা হলে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে এতোক্ষণ ছুটে অনেক দূর এগোতে পারতো, কিন্তু এক্ষেত্রে যে তাও হচ্ছে না।

শত দুশ্চিন্তা সত্বেও বাবার উপর রাগে অভিমানে ওর হাত-পা আছড়াতে ইচ্ছে করে। নিখিল নিজে অসুবিধায় পড়েছে বলে ততটা নয়, যতটা হচ্ছে—তিনি নিজেকে বাইরের লোকের কাছে সমালোচনার বস্তু করে তুলেছেন বলে।

মনে মনে প্রার্থনা করে, গিয়ে যেন দেখে—ভয়ঙ্কর একটা কিছু বিভ্রাট ঘটেছে। বরং বাবার বিপদও সহ্য করতে পারবে, তবু বাবার নিন্দে নয়।

মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থেকে নিখিল বললে—তবে এক কাজ করা যাক, আপনি এখানে বসে থাকুন, আমি গিয়ে গাড়ী নিয়ে আসি।

—পাগলা নাকি? আমি এই দুর্দ্দান্ত রোদে মাঠের মাঝখানে একা বসে থাকবো? বেশ বলছো তো! বারে ছেলে!

বসে থাকাটা যে সম্ভব নয় সেটা নিখিলও অস্বীকার করে না। কিন্তু করেই বা কি বেচারা? মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে নাকি অধ্যাপক পত্নীকে?

দিগন্তবিস্তৃত রুক্ষধূসর প্রান্তর যেন অগ্নি উদ্গীরণ করছে, শরতের শেষ হলেও রৌদ্রের তেজ সমান প্রখর। ছায়া লেশহীন জ্বলন্ত মেঠোপথ, শুধু জায়গায় জায়গায় নিরলস প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ সতেজ শালগাছ। পত্রবহুল হ'লেও ছায়াশ্যামল নয়। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর আলোয় নিজের বিরাট কাণ্ডকে কেন্দ্র করে অল্প একটু ছায়াবৃত্ত রচনা করে রেখেছে মাত্র।

—আশ্চর্য্য! একখানার বেশী ট্রেন নেই?

বলাকা দেবী আগুণের মতই ঝলসে ওঠেন। কথার সুর শুনে মনে করা অসম্ভব নয় যে নিখিল জেনে শুনে তাঁকে বিপদে ফেলতে এনেছে এখানে।

অল্প হেসে নিখিল বললে—কতটুকু দেশ, কটা লোক—যে দু'চারবার গাড়ী থামাবার কষ্ট স্বীকার করবে?

—কিন্তু এরকম পাণ্ডববর্জ্জিত জায়গায় আশ্রম করে কী উপকার হয়েছে শুনি?

বলাকা দেবীর রাগ দেখে আর না হেসে থাকতে পারে না নিখিল, দস্তুরমত হেসে ওঠে।

—পাণ্ডববর্জ্জিত হতে পারে, কিন্তু দুঃখী-বর্জ্জিত নয়, মিসেস চ্যাটার্জ্জি। চৌরঙ্গীতে বসে এদের কতটুকু উপকার করতে পারেন আপনি?

—চাইও না করতে। আমার প্রাণান্ত চেষ্টায় পৃথিবীর দুঃখের একবিন্দু লাঘব হবে—না দুঃখের সংখ্যা একটা কমবে? নষ্ট সিন্ধিল। তবে? ফরনাথিং খেটে মরি কেন?

তর্কের বিষয়-বস্তুটা বড়, তবে স্থান-কাল-পাত্র অনুকূল নয়। তা'ছাড়া অতিথির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়। আবহাওয়া বদলে নেওয়া ভালো।

হেসে উঠে নিখিল বলে—খাটতে পারবেন না বুঝতেই পারছি—ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাই করুন।

তখনো—প্রতিমুহূর্ত্তে আশা করতে থাকে খানিকটা অগ্রসর হ'তে হ'তেই হয়তো দেখা যাবে—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসা সাইকেল রিক্সখানার মধ্যে বাবার আগ্রহব্যাকুল মুখখানি, উৎসুক দৃষ্টি, ধবধবে খদ্দরের চাদরের একাংশ, সোনায় মাজা নীটোল বাহুর বলিষ্ঠ ভঙ্গী।

কিন্তু কই ?

এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে হাঁটাই কি সম্ভব ?

বাবার সম্বন্ধে কত গল্প করেছে সে মিসেস এবং মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির কাছে, গল্প করেছে—আশ্রমের সুন্দর-শৃঙ্খলা-সুব্যবস্থার কথা, উচ্চ আদর্শের কথা, সৌন্দর্য্যময় পবিত্র আবেষ্টনের মধ্যে নবপরিকল্পিত আশ্রম-গৃহের কথা—সবটা মিলিয়ে 'মৃণ্ময়ী সেবাশ্রম' যেন একটা সুন্দর শিল্পসৃষ্টি, স্রষ্টা তার মহান চরিত্র পিতা।

বলাকা দেবীকে আসবার জন্যে অনুরোধ না করুক, পরোক্ষে প্রলুব্ধ একরকম করেছিল বৈ কি। তিনি হচ্ছেন সেই ধরণের স্ত্রীলোক, যাঁরা নিত্য নূতন হুজুক নইলে বাঁচেন না। যা হয় একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত হওয়া, অধীর হওয়া, খেয়াল চরিতার্থ করতে না পেলে অধৈর্য্য হয়ে ওঠা, এই তাঁর স্বভাব।

অধ্যাপক স্বামীর নিস্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের ছন্দ মিলিয়ে চলতে যে শুধু অক্ষম তাই নয়, রাজীও নয়।

অবাধ স্বাধীনতা উপভোগের যে অন্তরায় মেয়েদের জীবনে আসে তা' থেকেও তিনি মুক্ত।

চাটার্জ্জি-দম্পতি নিঃসন্তান।

অটুট যৌবন আর অনবদ্য রূপ নিয়ে সুদীর্ঘ ত্রিশটী বছর ফ্যাসানের ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে, আর হুজুকের হাওয়ায় হৈ হৈ করে কাটিয়ে এলেন বলাকা দেবী।

কর্ম্মহীন অলস জীবন বটে, তবু তারুণ্যকে আটকে রাখবার একটা দুশ্চর তপস্যা আছে বৈ কি! তার জন্য পরিশ্রম না করলে চলবে কেন? ত্রিশবছরকে আঠারোর রূপ দিতে না পারলে অষ্টাদশীর লীলাচাপল্য মানাবে কেমন করে?

শুধু মুখের উপর ছবি আঁকাই নয়—হাসি, কথা, সামান্য ভঙ্গীটুকুও যে চারুশিল্পের অন্তর্গত, একথা এত বেশী করে কে অনুভব করেছে—বলাকা দেবীর মত?

এই আশ্রম দেখতে আসার দুরন্ত সখ, বাংলার পল্লী দেখে বেড়াবার সৌখিন আবদার—এও একরকম আর্ট নয় কি?

কাজেই মনে মনে যথেষ্ট বিচলিত হ'লেও চকচকে টাকটীতে হাত বুলিয়ে বিমর্ষমুখে সম্মতি দিতে হয়েছিল প্রফেসার চ্যাটার্জ্জিকে।

বলাকা দেবী চিন্তান্বিত ভাবে বলেন—কিন্তু ভাবছি গরুর গাড়ী চড়লে গায়ে ব্যথা হবে না তো?

—হতে পারে। কিন্তু ওই জুটলেই এখন যথেষ্ট ভাগ্য বলতে হবে।

এই নিখিল ছেলেটীকে বলাকা দেবী ঠিক আয়ত্ত করতে পারেন না। শুনলে অবাক হ'তে হয়—ও প্রথমদিনে তাঁকে 'মাসীমা' বলে ডেকেছিল। হয়তো প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির টাকের অনুপাতে সম্বন্ধটা ধার্য্য করেছিল। অল্প বয়সে বেয়াড়া ভুঁড়ি আর বেথাপ্পা টাক গজিয়ে বিটকেল করে তুলেছে লোকটা নিজেকে।

কিন্তু তাই বলে বলাকা দেবীকে 'মাসীমা'?

একটী সুশ্রী সুকুমার তরুণ? যে বয়সের ছেলেরা 'দিদি' 'বৌদি' 'ছোড়দি' পাতিয়ে গদগদ ভক্তিতে মুখের কথায় প্রাণটা বিসর্জ্জন দিতে পারে—বয়সে বড় অথচ সুন্দরী মহিলাদের জন্যে!

সারারাত সেদিন ঘুম হ'ল না বলাকা দেবীর। 'মাসীমা' শব্দটা কেবলি ছুঁচের মত ফুটতে থাকে মনের মধ্যে আর কিভাবে ওটা পাণ্টানো যায় তারই হিসাব করতে থাকেন।

অনেক কষ্টে অবশ্য সেই কিম্ভুত সম্বোধনটা ছাড়িয়েছিলেন—কিন্তু বান্ধবীর পর্য্যায়ে পড়তে পারলেন না আজ পর্য্যন্ত।

শিভাল্‌রি জ্ঞান নেই, মার্জ্জিত রুচির অভাব—হাজার হোক গাঁইয়া ভূত বৈ তো নয়—এই ভেবে আহত মনকে সান্ত্বনা দেন। ছেলেটা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী রত্ন সে কথাও তো অস্বীকার করা যায় না!

তা'ছাড়া ভালো চেহারা আর অনেক টাকার অধিকারী হ'লে তার ব্যবহারের ত্রুটি সহ্য করা যায়, এমন কি হাসিমুখেই করা যায়। "আপনাকে এনে কী কষ্টে ফেললাম···না জানি আমাদের হতভাগা দেশকে কি ভাবছেন আপনি"···ইত্যাদি বিনয়েগলা কথাগুলো বললে অবিশ্যি ভালোই লাগতো শুনতে, কিন্তু না বললেই বা করা যাচ্ছে কি?

—আচ্ছা তোমার নির্দ্দেশই শিরোধার্য্য—বলে নিখিল যে ছায়াটুকু নির্দ্দেশ করে দিয়েছিল, সেই বড় বাদাম গাচটীর গুড়িতে মাথা হেলিয়ে আঁকাছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন বলাকা দেবী।

মেয়েরা যে পুরুষের চেয়ে একচুল খাটো নয়—এ নিয়ে কাগজে কলমে আস্ফালন করা চলে, তর্ক করা চলে, 'লাঞ্ছিতা পদদলিতা' বঙ্গনারীর বিলুপ্ত দাবী নিয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যুদ্ধঘোষণা করা চলে, 'পুরুষের শাসন মানব না' বলে স্বামীর সঙ্গে কলহ করে পথে

বেরোনোও চলে, তাই বলে তো আর বেঘোরে পড়ে দু'দশ মাইল পথ হাঁটা চলে না ?

মেয়েদের বহন করে নিয়ে যাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে পুরুষের এটা আবার বলতে হবে না কি কষ্ট করে ?

নিজেকে এলিয়ে দেবার, 'আহা বেচারা' গোছ মনোভাব জাগিয়ে তোলবার, মাথার বোঝাকে মাথার মণি মনে করাতে পারবার—যে সূক্ষ্মবুদ্ধিটুকু, সেটুকুর দামই কি কম ?

'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থই যারা জানত না, সেকালের সেই নিরক্ষর ঠাকুমা বুড়িরাই তল্পি-তল্পা ব'য়ে পাহাড় ভেঙে তীর্থভ্রমণ করে বেড়াতো, অসম্ভব জায়গায় অঘটন ঘটিয়ে কাঠ কেটে জল তুলে প্রিয়জনের আরামের আর আহার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করতো, কোনো মাধুর্য্য কোনো সৌন্দর্য্যের ধার ধারতো না।

পুরুষের চক্ষুশূল সেই কাব্যগন্ধহীন স্ত্রীলোকগুলোর জন্যেই—'পথি নারী বিবর্জিতা'র হিতোপদেশ ছিল।

আধুনিক মেয়েরা আর যাই হোক, অত নীরেট নয়।

পথেঘাটে যথাসময়ে চায়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে 'মাথাধরার' ভোগটাও যে পুরুষকেই ভুগতে হবে, এ আবহাওয়াটা বাঁচিয়ে রাখবার কৌশল তা'দের জানা।

তাই নিখিলের সঙ্গে পল্লীভ্রমণ করে বেড়াবার সখের মধ্যে দ্বিধাবোধ করবার কিছু ছিল না বলাকা দেবীর। মাঠের মাঝখানে ছবির মত দাঁড়িয়ে পড়তে পারাটাও তো কম নয় ?

অনেক চেষ্টায় অনেক কষ্টে যখন সেই সত্যযুগীয় পুষ্পকরথই একখানা জোগাড় করা গেল, তখন রোদের ঝাঁজ কমে গিয়ে শরৎ অপরাহ্ণের মিষ্টি হাওয়া বইতে সুরু করেছে।

পথ আর পথের দু-পাশের দৃশ্য হয়ে উঠেছে উপভোগ্য।

গরুর গাড়ীর উত্থান-পতনলীলার সঙ্গে তাল রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হাসির বন্যায় ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে যান বলাকা দেবী।

—কী মজা! কী মজা! চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স! হাড় কখানা কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তো নিখিল?—কিন্তু কী সুন্দর! নাইস! নাইস! কি যে তোমাদের সেই রবিবাবুর কবিতা আছে? "আজি কি তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে, হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে—" ঠিক তেমনি!...আঃ...আমি যদি এখানের একটি 'কিষাণ বৌ' হতাম! জলের কলসী মাথায় নিয়ে এই সবুজ শোভার মধ্য দিয়ে ভাটিয়ালী গান গাইতে গাইতে যেতাম!

নিখিল মৃদু হাসলো।

বলাকা দেবী হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে বলে উঠলেন—আরে ব্যস! কী মজা!...ও নিখিল, তুমি গান গাইতে পারো?

নিখিল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—আমি? গান? না!

বলাকা দেবী আবারও বলে উঠেন—আমার কিন্তু ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে গান গাই! যতো দোলা লাগছে, ততোই গান গাইতে ইচ্ছে করছে!

নিখিল এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে—ইচ্ছেটা আর কাজে খাটাবেন না মিসেস চ্যাটার্জ্জি! এদেশের লোকজন তেমন বুদ্ধিমান নয়, হয়তো নিন্দে করে বসবে!

বলাকা ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠেন—লোক-নিন্দেকে আমি কেয়ার করি না!

…আমি শুধু ভাবছি—ঠিক এই পরিবেশে কোন্ গানটা মানায়! সেই যে একটা গান আছে—

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী !
ছড়িয়ে গেলো ছড়িয়ে গেলো ছাপিয়ে
মোহন অঙ্গুলী !
শরৎ তোমার শিশির ধোয়া কুন্তলে—

নিখিল অস্থিরভাবে বলে—মনটা ভাল লাগছে না মিসেস চ্যাটার্জ্জি ! বাবার অসুখ-টসুখ কিছু করলো না কি তাই ভাবছি !

গাড়োয়ান বেটা নেহাৎ চাষা বলেই মনে মনে ভাবে…'মাগী কি বাচাল বটে, খোকাবাবু আবার এটাকে জোটালে কোন্ চুলো থেকে ?' 'আছ্রমের' জন্যে মাষ্টারণী নিয়ে যাচ্ছে হবেক বা।'

প্রশ্ন করতে সাহসে কুলিয়ে ওঠে না।

বাবাকে অসুস্থ দেখতে হবে গিয়ে, এই ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিল নিখিল, কিন্তু গিয়ে যা শুনলো, তা একেবারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আশ্রমের ম্যানেজার নৃপেনবাবু যেরকম কুণ্ঠিতভাবে দিলেন সংবাদটা, সহজেই সন্দেহ হয় ভিতরের কোন গুরুতর তথ্য চেপে যাচ্ছেন।

স্তম্ভিত নিখিল অবাক বিস্ময়ে বার বার প্রশ্ন করতে থাকে—বাবা এখানে নেই? আশ্রমের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেছেন? 'শালবনীর' কাছারী বাড়ীতে গিয়ে বাস করছেন? বলছেন কি বলুন তো? ব্যাপারটা ভালো করে বোঝান তো আমায়। আপনি বলছেন বাবা দু'মাস এখানে অনুপস্থিত—অথচ প্রত্যেক চিঠিই আমি এখানের ঠিকানায় দিচ্ছি- এবং উত্তরও পেয়ে আসছি বরাবর। গত সপ্তাহেও—

নৃপেনবাবু মাথা চুলকে বলেন—চিঠিপত্রের জন্যে ওই রকম একটা ব্যবস্থা করা আছে কি না।

—কেন বলুন তো? অজ্ঞাতবাস নাকি? না কি—তপস্যা-টপস্যা কিছু করতে সুরু করেছেন?

সূক্ষ্ম একটা হাসির আভাস নৃপেনবাবুর গোঁফের অন্তরালে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন—আমাকে মাপ করতে হবে নিখিলবাবু। ধরুন না-হয় অজ্ঞাতবাসই, কিন্তু আমার মনে হয়—এক্ষেত্রে আপনার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভালো,—বলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিখিলের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী মহিলাটীর দিকে তাকান।

বোঝা গেল এই অপরিচিতা মহিলাটীকে খুব সুদৃষ্টিতে দেখছেন না বৰ্ণি এবং ওঁর সামনে ঘরের কথা খুলে বলতেও নারাজ।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে ঈষৎ এগিয়ে এসে মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন—কিন্তু কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কি দরকার হচ্ছে নিখিল? তোমাদের রাজত্বটা দেখে বেড়ানোই তো আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে? আমি তো তোমার বাবাকে দেখতে আসিনি, এসেছি পল্লীগ্রাম দেখতে। এদিকটা দেখে-টেখে বরং ওই শালবনী—না কি—ঘুরে যাওয়া যাবে। এতো দুঃখিত হবার কি আছে?

নিখিল অন্যমনস্ক স্বরে বললে—সে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না মিসেস.চ্যাটার্জ্জি! বাবাকে তো আপনি জানেন না, বাবার পক্ষে কোনো কারণেই কোন গোপনতার আশ্রয় নেবার দরকার হতে পারে—এ আমার ধারণার বাইরে।

—তোমার সবই বাড়াবাড়ি নিখিল,—বলাকা দেবী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—ছোট জিনিসকে বড় করে দেখার মানে হয় না কিছু। অতবড় জমিদারী তোমার বাবার, নানা কারণে গোলমাল বাধতে পারে, হঠাৎ যে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে না এমন কি কথা আছে? বর্ত্তমান যুগে প্রজা-বিদ্রোহ তো লেগেই আছে।

—বাবা বিষয়-সম্পত্তির কিছু দেখেন না কখনো।

—কখনো দেখেন না বলেই যে কখনও দেখবেন না—এ তোমার অন্যায় আব্দার নিখিল। তা'ছাড়া—চিরদিনই যে এই আশ্রম নিয়ে পড়ে থাকতে হবে এরও কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। বুড়ো বয়সে রেষ্ট নেবার ইচ্ছেও তো হতে পারে?

—বুড়ো বয়সে?—বিষণ্ণ চিত্তে হেসে ফেলে নিখিল,—বাবাকে আপনি কি ভেবে রেখেছেন বলুন তো? 'পলিত কেশ গলিত [illegible]' একটা? মাত্র বেয়াল্লিশ বছর বয়স তাঁর।

—বেয়াল্লিশ?

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকে তাকালেন বলাকা দেবী—হিসেবটা মিলোনো শক্ত হচ্ছে—আশা করি তুমি তাঁর পালিত পুত্র নও?

—নিশ্চয় না!

এইবার সকৌতুকে হো হো করে হেসে ওঠে নিখিল।

—সেকেলে জমিদার বাড়ীর ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন—প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সংসার প্রবেশের পরীক্ষাটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ঠাকুর্দ্দা-ঠাকুমা কর্ত্তব্যের বোঝা হাল্‌কা করে বাঁচলেন—এদিকে বাবার প্রাণান্ত, কুড়ি বছর বয়স হতে না হতেই এহেন পুত্ররত্ন'লাভ।

বলাকা দেবী যেন ক্রমশঃই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন নিখিলের পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে। বলেন—প্রাণান্ত কিসে?

—এই তো—ছেলে বলে মানতেই চায় না লোকে। বাস্তবিক বাবাকে আর আমাকে হঠাৎ দেখলে ছোট বড় ভাইয়ের মতন দেখতে লাগে। অবিশ্যি আমার চেয়ে অনেক ফর্সা বাবা!

বলাকা দেবী বাঁকা চোখে তাকালেন একটু, কারণ নিখিলের রংটাও ফেল্‌না নয়। পাকা সোনার মত উজ্জ্বল রং, সুশ্রী সুকুমার মুখ, আর দীর্ঘ উন্নত দেহ, সবটা মিলিয়ে একটা আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

—কিছু মনে করবেন না, আমাদের বংশটা রূপের জন্য বিখ্যাত। ঠাকুমাকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হতো, গরদের থান পরে থাকলে গায়ের রঙের সঙ্গে তফাৎ করা শক্ত হয়ে উঠতো। শুধু আমিই কালো আমার মায়ের মত, যদিও মাকে আমার মনে পড়ে না।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি হয়তো আলোচনাটা আরো চালাতেন কিন্তু বাধা পড়লো[illegible]। [illegible]লেন—যাই হোক আজ রাত্রে তো আর কোথাও

বোঝা গেল এই

[illegible]নি এবং ওঁর সামনে ঘ[illegible]ল কিছু ভেবে আসেনি, জানতো—'বাবা

আছেন সব ঠিক হয়ে যাবে'। একটু ভেবে নিয়ে বললে—শৈলদিকে বললে বোধ হয় হয়ে যাবে একটা কিছু ?

—হবে তো নিশ্চয়ই ! তবে আশ্রমের মেয়েদের তো কম্বল আর চটের বালিশ, তা'তে কি আর উনি—কথার শেষে ড্যাস্ দিয়ে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু বেশ কিছু উহ্য থাকলো। মহিলাটীকে যে তিনি বিশেষ ভালো চক্ষে দেখেননি সেটা গোপন করবারও বিশেষ চেষ্টা দেখা গেল না।

নিখিল কিছু বলবার আগেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি লীলায়িত ভঙ্গীতে দু' হাত জোড় করে বললেন—রক্ষে করুন, আপনাদের কম্বলশয্যায় আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই, দয়া করে ইজিচেয়ার জোগাড় করে দেবেন একটা, রাতটা কেটে যাবে।

যেন এরকম জায়গায় ইজিচেয়ারটাই নিতান্ত সুলভ।

অবশেষে—ভেবে চিন্তে আশ্রমের ডাক্তার মিহির গুপ্তের কোয়ার্টার্স থেকে নেয়ারের খাট আর চাদর বালিশ আনিয়ে নিয়ে—বলাকা দেবীর এবং আশ্রম—উভয় পক্ষের মান বজায় রাখার চেষ্টা হলো। কিন্তু বলাকা দেবী আর একবার বায়না নিলেন—কী, এই খট্টাঙ্গ পুরাণে রাত্রিবাস করতে হবে না কি ?—ও নিখিল, তোমাদের দেশের ব্যবস্থা যতো দেখছি ততোই যে তাজ্জব বনে যাচ্ছি !

নিখিল প্রায় কাতর ভাবে বলে—গরীবের আস্তানায় ওর বেশী আর কিছু পাবেন না মিসেস চ্যাটার্জ্জি। কষ্ট করুন ! কষ্ট করবেন বলেই তো এসেছেন !

অনেক রাত্রে বলাকা দেবীর সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিখিল শৈলদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। বিভূতিবাবু এঁকে মাসীমা বলেন, সেই সূত্রে নিখিলের 'দিদি'।

আশ্রমের মহিলামহলের ইনিই কর্ণধার।

দরকার হলে আশ্রমবাসীদেরও কর্ণধারণ করতে ছাড়েন না। বাঘরাশ নৃপেনবাবু পর্যন্ত এঁকে ভয় করে চলেন। দুর্দান্ত মানুষ নয়, খাঁটি মানুষ। যেমনি নিয়মী তেমনি পরিশ্রমী, বিভূতিবাবুর অনুপস্থিতিতে আশ্রমের কাজ আটকাচ্ছে না, কিন্তু শৈলদি একদিন অনুপস্থিত থাকলে চালুমেসিন অচল।

এসময়টা তিনি আলো জ্বালিয়ে বইটই পড়েন নিখিল জানে, তাই দরজায় এসে দাঁড়ালো।

দরজার ভিতর ছায়া পড়তেই শৈলদি মুখ না তুলেই বই বন্ধ করে রেখে বললেন—আয় নিখিল, তোর জন্যেই আরো জেগে বসেছিলাম এতক্ষণ।

—বারে, আপনি জানলেন কি করে যে আমি আসবো?

—হাত গুণতে জানি। আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? 'বাবা কেন আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন'—এই জানতে এসেছিস তো?

—নাঃ, সত্যিই হাত গুণতে পারেন দেখছি, ভাবছিলাম কি করে কথাটা পাড়ি। 'আচ্ছা বলুন তো সত্যি, আমি তো রহস্যের কূলকিনারা কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

—কূলকিনারা খোঁজবার চেষ্টা না করলেই বা ক্ষতি কি বল দিকিন? মনে কর আমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছেন।

বলে মৃদু হেসে চুপ করলেন শৈলবালা।

—যেটা অসম্ভব সেটাই বা মনে করতে যাবো কেন শুনি?

হ্যারিকেনটার সামনে একটা বই আড়াল দিয়ে বোধকরি দৃষ্টিকটু আলোটা সহনীয় করে নিয়ে শৈলদি একটু থেমে বললেন—আর যদি ওর চাইতে আরো অসম্ভব, হাজার গুণ অসম্ভব কথা শোনাই কি করবি ?

হঠাৎ কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে নিখিল।

মধ্যরাত্রির থমথমে অন্ধকার নিদ্রিত আশ্রম বাড়ীর গভীর স্তব্ধতা, পিছনের বিরাট উন্মুক্ত প্রাঙ্গণবাহী ঝোড়ো হাওয়ার শন্‌শনানি, আর অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত দীপ্শিখার কম্পমান ছায়ার আলো-আঁধারি, সবটা মিলিয়ে একটা গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করেছিল, তার উপর সহজ মানুষ শৈলদির এরকম রহস্যাবৃত কথায় সারাদিনের ক্লান্ত দেহমন যেন অবশ অবসন্ন হয়ে আসে—দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার আর সাহস হয় না।

—কিরে ভয় পেয়ে গেলি নাকি ?

শৈলদি একটু শব্দ করে হেসে ওঠেন।

—না, ভয় করবো কেন ? ভয়ের কি হচ্ছে ?—নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নেয় নিখিল।

আবহাওয়াটা হালকা করে নেবার জন্যেই বোধ করি শৈলদি সহজ পরিহাসের স্বরে বলে ওঠেন—

—ভরসারই বা কি বল ? তোর যে সৎমা হয়েছে রে—

—কি হয়েছে ?

চম্‌কানিটা সুস্পষ্ট।

শৈলবালা বলেন—ওই তো—চমকে উঠলি, 'সৎমা' কথাটার মানে ভুলে গেছিস না কি রে ? সাধুবাক্যে যাকে বিমাতা বলে। ঢুকছে মাথায় ?

—নাঃ—বলে হতাশভাবে মাথা নাড়ে নিখিল।

—কেন? না ঢোকবার কি আছে? তোর বাবার কি বিয়ের বয়স ফুরিয়ে গেছে? চিরদিন সন্নিসি হয়ে থাকবে—এমন কি কথা?

—ঠাট্টা-তামাসা ছাড়ুন শৈলদি, আসল খবরটা দিন আমায়।

এবার যেন একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন শৈলদি—চেষ্টাকৃত হাসির আবরণ ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বলেন—ওইতো আসল খবর। আশ্রমে কল্যাণী বলে একটি মেয়ে ছিলো, তাকে বোধ হয় লক্ষ্য করিসনি তুই, কি জানি হয়তো দেখিসইনি, তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি বিভূতিকে।

—বিয়ে!

শুধু এই কথাটুকু উচ্চারণ করে নিখিল।

শৈলদেবী ঈষৎ জোরের সঙ্গে বলেন—হ্যাঁ বিয়ে! কতো লোক তো দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করে, এ ব্যাপারটাকেও তেমনি সহজভাবে মেনে নে না?

নিখিল ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে—তা' হয় না শৈলদি, গায়ের জোরে একটা কঠিন জিনিসকে সহজ করা যায়না। বাবার সম্বন্ধে একথা আমি ভাবতেই পারবো না।

শৈলদেবী শান্তকণ্ঠে বলেন—তোর এ জেদ নিখিল যেন জোর করে চোখ ঢেকে রেখে আলোকে অস্বীকার করা।...বাবাকে তো এতো ভালোবাসিস, একবার সেই ভালোবাসার চোখ দিয়ে দেখ দিকি, সত্যিই কি এর কিছু দরকার ছিলো না?...চিরদিন ভেবে এসেছিস বাবা 'মহৎ', বাবা 'দেবতা', বাবা সকলের আশ্রয়, বাবারও যে কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজন আছে তা' কোনোদিন খেয়াল করিসনি। 'মৃণ্ময়ী' যখন মারা গেছে তখন বিভূতির মোটে পঁচিশ বছর বয়েস, তুই দেড় বছরের ছেলে।... সেদিনকার হৃদয়ের শূন্যতা ও পূরণ করতে চেয়েছিলো বড়ো একটা আদর্শ দিয়ে। এতোকাল ধরে নিজেকে তাই বুঝিয়ে রেখেও ছিলো হয়তো—

এইভাবেই বাকী জীবনটাও কেটেই যেতো, যদি কল্যাণীর মতো মেয়ে ওর সামনে এসে না দাঁড়াতো।…কল্যাণীকে না দেখলে বিভূতির নিজের কাছেও ধরা পড়তো না যে, ও এখনো ফুরিয়ে যায়নি।…হাঁ করে দেখছিস কি ?…ভাবছিস 'শৈলদি আবার এতোবড়ো বক্তৃতা দিতে শিখলো কবে' কেমন ?…তোর মনের দ্বিধা ঘোচাতেই এতো কথা বলতে হচ্ছেরে ?… বড়ো তো হয়েছিস, ভেবে দেখ দিকি কী নিঃসঙ্গ জীবন ওর।…মানুষ তো আকাশ নয় যে, শুধু ওপর থেকে আলো বিতরণ করেই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকবে ? মানুষ যে এই মাটির পৃথিবীর, গাছের মতো তার প্রকৃতি, সে অজস্র ধারায় ফুল বিলোবে, ফল জোগাবে, কিন্তু নিজের তার চাই মাটি থেকে রসের জোগান। সে রসে যাদের প্রয়োজন নেই, তারা হচ্ছে উগ্র সন্ন্যাসী।…কিন্তু বিভূতি তো আমার তা' নয়, সে যে মমতার ঠাকুর!… কল্যাণীর অন্ধ ভালোবাসাকে সে অবহেলা করতে পারছিলো না, আবার এতোদিনের সংস্কারকেও ঝেড়ে ফেলতে পারছিলো না, তাইতো—আমাকে আসতে হলো এগিয়ে।

দেখলাম মনের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে জয় করবার জোর সে খুঁজে পাচ্ছেনা, তাই জোর দেখাতে হলো আমাকে।…তোর কাছে আর কি লুকোবো— একরাতে হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখলাম— বিছানায় কল্যাণী নেই! ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে উঠে পড়লাম, মনে মনে বললাম—'গুরু রক্ষা কোরো'!…গিয়ে দেখলাম তোর বাবার ঘরে কল্যাণী দাঁড়িয়ে। টেবিল থেকে বিভূতির ফটোখানা তুলে নিতে গিয়েছিলো— হাত থেকে পড়ে কুচি কুচি হয়ে গেছে—এ শব্দ তারই। বিভূতি বললো— "এ ঘরে তোমার এমন কি দরকার পড়েছিলো কল্যাণী যে সময় অসময়ের বিচার হারিয়েছো ? বলো কি সে দরকার ?"…চিরদিনের নম্র কুণ্ঠিত মেয়েটা, বিভূতির সঙ্গে মুখ তুলে একটা কথা কইতে যে পারে না, সে মুখ

তুলে স্পষ্টগলায় বললে—"যদি বলি চুরি করতে এসেছিলাম" ?···মনে ক'চ্ছিস উপন্যাসের কাহিনী শুনছিস ?···তা' উপন্যাস তো আকাশ থেকে পড়ে না রে ?···সে তো মানুষের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি !···বিভূতির তখনকার সেই যন্ত্রণা-কাতর মুখ যদি দেখতিস নিখিল।···তাইতো তা'কে তার এই পুরনো পরিবেশ থেকে সরিয়ে দিলাম।···শালবনীর বাড়ীতে স্বাভাবিক জীবনের স্পর্শ আছে, সেখানে আজও একটা বন্ধ ঘরে তোর ছেলেবেলাকার বেতের দোলনাটা টাঙানো আছে।···হয়তো সে বাড়ীর ছোঁওয়ায়, সেখানের হাওয়ায় ওর মনে পড়বে চিরদিনই ও পাথরের দেবতা ছিলো না।

কথার শেষের দিকটা ভারী হয়ে আসে শৈলদেবীর। মুখ ফিরিয়ে একবার জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

একটু পরে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কি বলতে গিয়ে দেখলেন নিখিল কখন উঠে গেছে।

নিখিল যে খুব বেশী মর্ম্মাহত হয়ে গেল তা' নয়, আচম্‌কা একটা ধারণাতীত বস্তুকে আয়ত্ত করতে গিয়ে যেন হাঁফিয়ে উঠল।

হঠাৎ আঘাতে বেদনা বোধের বৃত্তিটা অসাড় হয়ে যায়।

বিভূতিবাবুর নির্দ্দিষ্ট ঘরখানা তালাবন্ধ পড়ে ছিল, নৃপেনবাবু খুলিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। শৈলদির ঘর থেকে উঠে এসে মাতালের মত টলতে টলতে মেজেয় পাতা বিছানায় ঝুপ্ করে শুয়ে পড়লো।

খাট পালঙ্কের পাট এখানে নেই।

ওদিকের দেয়াল ঘেঁসে জলচৌকির উপর একখানা কম্বল ভাঁজ করে গোটানো ও খান দুই মোটা মোটা বই—বিভূতিবাবুর অভিনব বালিশ।

আসবাবপত্র নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেয়ালে আটকানো আলনায় একখানা আধময়লা খদ্দরের চাদর ও একটা পুরনো গেঞ্জি ঝুলছে, কয়েকখানা ইঁটের উপর বসানো একটা ছোটোখাটো মজবুত ষ্টীল ট্রাঙ্ক, কুলুঙ্গিতে রক্ষিত একটি মাকড়সার জাল বেষ্টিত ধূলি-ধূসরিত জলের কুঁজা।

এই সম্পত্তি বিভূতিবাবুর।

ধনীর দুলাল বিভূতিভূষণ পূর্ণযৌবনের উদ্দাম তরঙ্গময় দিন থেকে এই সুদীর্ঘকাল এমনি কৃচ্ছ্রসাধন করে আসছেন। অকালগত স্ত্রীর পুণ্য নাম জড়িত "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রম" তাঁর সাধনার সিদ্ধি—জীবনের অবলম্বন। এর প্রতিটি ধূলিকণাও তাঁর স্নেহরসে সঞ্জীবিত।

নিখিল ছোট থাকতে—দেশের বাড়ীতে গিয়ে অল্প কয়েকদিন কাটিয়ে আসতেন মাঝে মাঝে, বিধবা বোন ছিলেন সেখানে, তা' সেও চুকে গেছে অনেকদিন।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ নক্ষত্রালোকিত বোবা আকাশের পানে বিনিদ্র দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে নিখিল……কে সেই অলোক-সামান্যা নারী যার মোহে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত আযৌবন ব্রহ্মচারী তার পিতার ব্রত ভঙ্গ হ'ল?

সত্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করবার গোপন ছিদ্র আবিষ্কার করলো সে কোন ছলে? কোন দুর্নিবার আকর্ষণে সেই ধীর আত্মস্থ পুরুষ জীবনের সমস্ত সঙ্কটকাল অতিক্রম করে এসে এমন অদ্ভুত পরাজয় স্বীকার করলেন? ভূমিকম্প? বজ্রপাত? যা পাহাড় ভেঙে চৌচির করে দেয়, বিশাল শালবৃক্ষের মূল উৎপাটন করে?

অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করে নিয়ে জেনে বুঝে তার কাছে

আত্ম-সমর্পণ করার মত দুর্ব্বলতা কোথায় লুকানো ছিল তাঁর বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডে ?

কোন অন্ধকার গুহায় লালিত, রাক্ষস কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গের প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার আদর্শ চরিত্র পিতার আজন্ম অর্জ্জিত শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা শালীনতা সমস্ত একলহমায় গ্রাস করে বসলো ?......শৈলদেবী অনেক বোঝালেন কিন্তু বোঝা কি বোঝানোর মতো সহজ ?

নিরুত্তর প্রশ্নে আপনাকে আপনি ক্ষত-বিক্ষত করতে করতে কখন একসময় ঘুম এসে গেল বোধকরি নিতান্তই শারীরিক ক্লান্তিতে।

পরদিন সকালে বেশ কিছু বেলায় ঘুম ভাঙলো বলাকা দেবীর কলকাকলীতে।

—কী আশ্চর্য্য ছেলে তুমি নিখিল! এখনো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছো ? আর আমি কখন উঠে সমস্ত দেখেশুনে পুরানো করে ফেললাম।

ঘুমে ভারী চোখের পাতা কষ্টে খুলে প্রথমটা ঠাহর করে উঠতে পারে না নিখিল আছে কোথায় সে ?

মাথাটা একবার ঝেড়ে উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে সমস্ত মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল গত রাত্রির তীব্র চিন্তার গ্লানি।

অন্য সময় যখন এসেছে—এই সময় ডেকে ঘুম ভাঙাতেন বাবা, প্রাতঃভ্রমণ সেরে আশ্রমের বাগান দেখাশোনা করে এতক্ষণে ফিরবার সময় হ'ত তাঁর।

চিরদিনের ঘুমকাতুরে নিখিলের বিছানার কাছে ঈষৎ অবনত হয়ে দাঁড়িয়ে সস্নেহ পরিহাসের স্বরে ডাকতেন—"কি হে নিখিলবাবু, নিদ্রা ভঙ্গ

হ'ল ? কলকাতায় থেকে ঘুমের অভ্যাসটি বেশ বাদশাহী করে তুলেছ বাপ, জমিদারের নাতি বটে ! গাত্রোত্থান হবে না কি ? আপনার 'অনারে' আজ আশ্রমে রীতিমত ভোজের ব্যবস্থা যে—ছেলেমেয়েগুলো ভাবছে ফস্কে গেল বুঝি বা।"

সেই তার পরম স্নেহময় পিতার অভাবে বিকল মনটা অকারণে হঠাৎ মিসেস চ্যাটার্জ্জির উপর খাপ্‌পা হয়ে উঠলো। কুক্ষণে তাঁকে সঙ্গে এনেছিল। 'অপয়া' কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে মেয়েদের মতন।

আবার একবার হাসির সঙ্গে কথার সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো—কই উঠলে ? খুব ঘুম তো ? সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফাঁকে একখানি প্রসাধন-রঞ্জিত উজ্জ্বল মুখ। এই ভোরবেলাতেই সারা হয়ে গেছে সমস্ত বেশ-বিন্যাস, কাজলের রেখা, ঠোঁটের রং, ভুরুর ভঙ্গিমা, চিবুকের ডানপাশ ঘেঁসে একটি কৃত্রিম তিল, ব্যতিক্রম হয়নি কিছুর—সবকিছু নির্ভুল পরিপাটি।

বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা তিক্ত হয়ে উঠলেও বাহ্যিক ভদ্রতার হাসি হেসে বলতে হবে একটা কিছু, করতে হবে হাসিখুসির অভিনয়।

বাবার পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ঘরে শ্রদ্ধালেশহীন মিসেস চ্যাটার্জ্জির স্যাণ্ডাল শোভিত পদক্ষেপের ভয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে নিখিল।

যা হয়েছে হো'ক, সে অবর্ণনীয় ক্ষতির পরিমাপ করা শক্ত, কিন্তু যা ছিল—তা'র অবমাননা করবে কোন হিসেবে ? দেখলে—গতরাত্রির বিক্ষোভ কখন শান্ত হয়ে গেছে। সেই অবিশ্বাস্য কলঙ্ককাহিনী স্মরণ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কই পিতার বিরুদ্ধে খুব একটা দুরন্ত ঘৃণা অথবা দুর্জ্জয় ক্রোধ কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছে না মনের মধ্যে ?

শুধু একটা সকরুণ বেদনাবোধ। হয় তো সূক্ষ্ম একটু অভিমান।

কেন তিনি শ্রদ্ধা সম্মানের উচ্চ শিখর থেকে নেমে এলেন পথের ধুলোয় ? নিজেকে দাঁড় করালেন্ অপরের বিচার দৃষ্টির সামনে ?

নিখিলের যা ক্ষতি হয় হো'ক, রাস্তার পাঁচজনে এসে তার পূজার দেবতার গায়ে ধূলো দিয়ে যাবে এ চিন্তা অসহ্য।

বলাকা দেবী ওর মুখের পানে চেয়ে একটু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—সারারাত ঘুম হয়নি না কি নিখিল? মুখ-চোখ এমন শুকিয়ে গেছে যে?

—এমনি। ঘুমটা হয়নি ভালো, আপনি ঘুমোতে পেরেছিলেন তো?

—মন্দ নয়। টায়ার্ড্‌ও কম ছিলাম না তো? তাই বলে তোমার মত আজ পর্য্যন্ত তার জের টানছি না মহাশয়। কই এখানে কি কি দ্রষ্টব্য আছে সেগুলো দেখিয়ে দাও চট্‌পট্‌?

—দ্রষ্টব্য? দ্রষ্টব্য বলতে এখানে আর কি-ই বা আছে?

নিখিল একটা আলস্য ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললে—বরং তোমাকেই এখানে দ্রষ্টব্য মনে করতে পারে লোকে।

আশ্রম পরিদর্শন করতে অবশ্য মাঝে মাঝে আসে লোকে। নানা বিভাগ, নানা প্রকার কাজকর্ম্ম, আশ্রমবাসী দুঃস্থ অনাথদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহায্য কেন্দ্রের হিসাব নিকাশ সব কিছু দেখিয়ে বেড়াবার উৎসাহ তা'রও কম ছিল না, সুযোগ পেলে করতে ছাড়ত না।

আজ আর কোন প্রেরণা খুঁজে পেল না। যে উৎসাহে মিসেস চ্যাটার্জ্জির কাছে আলোচনা করেছে আগে, তার একতিলও অবশিষ্ট নেই।

কাজকর্ম্ম হয় তো ঠিকভাবেই চলছে কিন্তু নিখিলের কাছে ওর যথার্থ কোনো মূল্য আছে কি? প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর শূন্যমণ্ডপের মতই অর্থহীন আকর্ষণহীন।

নিখিলের বিপর্য্যস্ত মনের খবর বলাকা দেবীর চতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়তে দেরী হ'ল না, কারণ এইমাত্র আশ্রমের একটী নিতান্ত নির্ব্বোধ মেয়ের কাছ থেকে সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

মুখটিপে হেসে বললেন—বিমাতার তাড়নার ভয়ে ধ্রুব যে এখনি শুকিয়ে উঠলেন!

নিখিল চকিতে মুখ তুলেই নামিয়ে নিলে।

কী আশ্চর্য্য! ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই সুখবরটী দিলে কে এঁকে? শৈলদি কি আর গল্প করবার লোক পেলেন না? কিন্তু তাই কি সম্ভব? বয়সে অনেক বড় হ'লেও বিভূতিবাবুর উপর তাঁর অচঞ্চল শ্রদ্ধা-ভক্তির খবর তো নিখিলের অবিদিত নয়?

কে বললে?

কী বলেছে, কতদূর বলেছে, কত কি বানিয়ে বলেছে কে জানে!

ধিক্কারে মাথা হেঁট হয়ে গেলেও নিজেকে নিজে সামলে নিলে নিখিল। সত্যি, খেলো হয়েই বা পড়বে কেন সে?

হেসে উঠে বলে—শুকিয়ে উঠবো কেন বলুন তো? বরং মাতৃহীন হতভাগা একটা মা পাওয়ার খবরে খুশীই হয়েছে, বাবাকে তবু, আমাদের একজন বলে মনে হচ্ছে।

বানানো কথাটা বলতে গিয়ে নিখিল হঠাৎ যেন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠলো। কথাটা সত্যি নয় তো?

একান্ত প্রিয়জনকে দেবতা ভাবতে পারার একটা গৌরব আছে সত্যি, কিন্তু 'মানুষ' ভাবতে পারার মধ্যে কি কিছুই নেই? কিছু তৃপ্তি, কিছু নিশ্চিন্ততা?

এই সময় দালানের ওদিক থেকে শৈলদির গলার স্বর শোনা গেল, এবং কেউ কিছু বলবার আগেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলেন—তোমাদের এখানে চায়ের ব্যবস্থা কি একেবারেই নেই না কি? তা'হলে তো দেখছি এখুনি কলকাতার টিকিট কাটতে হয়। এমন জানলে—

ছাঁটা চুল, ছোটোখাটো গড়ন, একখানি থান মাত্র পরা, শ্যামবর্ণ মানুষটিকে দাসী ব্যতীত আর কিছুই ভাবেননি বলাকা দেবী। তা'ছাড়া গত রাত্রে খাওয়া শোওয়ার সমস্ত ব্যাপারে একেই খাটতে দেখেছেন।

শৈলদির বুঝতে দেরী হয় না ব্যাপারটা, কিন্তু নিখিল অবাক বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে কার উদ্দেশ্যে কথা'কটি উচ্চারিত হ'ল, দেখতে।

একমাত্র শৈলদিই আসছেন নিখিলের কাছে।

—এই যে মা, চায়ের জন্যেই ডাকতে এসেছি, নিখিল আর কত শুয়ে পড়ে থাকবি? নে শিগগির চটপট তৈরি হয়ে নে, ডাক্তারবাবুর ওখানে আজ তোদের চায়ের নেমন্তন্ন।

বলে যুগপৎ উভয়কেই চমকিত করে দিয়ে শৈলদি এসে দাঁড়ালেন।

বলাকা দেবী উদ্বিগ্ন মুখে ঈষৎ নীচুস্বরে দ্রুত উচ্চারিত ইংরাজিতে প্রশ্ন করলেন—কি আশ্চর্য্য! উনি তোমার আত্মীয়া না কি?

—শুধু আত্মীয়া নয়, রীতিমত শ্রদ্ধেয়া গুরুজন, কিন্তু বাংলায় বললেও ক্ষতি ছিল না, উনি দুটো ভাষাই সমান বোঝেন—কণ্ঠস্বরে মনের চাপা বিরক্তি কতকটা প্রকাশ করে ফেলে নিখিল এগিয়ে গিয়ে বলে—কিন্তু আজকেই হঠাৎ ডাক্তারবাবুর এত ভক্তি উথলে উঠলো কেন বলুন তো শৈলদি?

—কার কখন কি জন্যে ভক্তি উথলে ওঠে আমি তার হিসেব রেখে বেড়াচ্ছি বুঝি ? আর—মানুষ মানুষকে নেমন্তন্ন করবে না তো বনের পশুপক্ষীকে করতে যাবে না কি রে ?

বলে প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন শৈলদি।

কারণ আসল খবর, নিমন্ত্রণটা তাঁরই ব্যবস্থার ফল।

নিখিলও যে কতকটা অনুমান না করে এমন নয়, কিন্তু বেশী কথা বাড়ায় না। যদিও বেশী দূর যেতে হবে না—আশ্রম-সংলগ্ন একখানি ছোট বাংলোয় ডাক্তারবাবুর বাসা, তবু নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা নিখিলের তেমন পছন্দ হ'ল না। চক্ষুলজ্জা তো বটেই, তা'ছাড়া বালাকা দেবীকে নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াবার স্পৃহা তা'র আর বিন্দুমাত্রও নেই।

অথচ—প্রতি কথায় কলকাতার টিকিট কাটার কথা তুললেও তিনি যে এখন সহজে কলকাতায় ফিরে যেতে চাইবেন না, এটা ক্রমশই টের পাচ্ছিল নিখিল।

যারা উপভোগের খাতিরে দুর্ভোগ সইতে পিছপা হয় না তাদের দলের লোক বলাকা দেবী। কিন্তু মজা এই—প্রতি মুহূর্ত্তে খুঁৎ খুঁৎ করবেন, বিরক্তি প্রকাশ করবেন এবং ইচ্ছে করে তাঁকে কষ্টে ফেলা হয়েছে—এই রকম একটা স্পষ্ট অভিযোগের ভাব সর্ব্বদা চোখে মুখে ফুটিয়ে রাখতে দ্বিধা করবেন না।

অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে বজায় রাখতে চাইবেন কিশোরীর লীলা-চাপল্য। হয় তো ছুটবেন একটা রঙিন প্রজাপতির পিছনে, উঠতে যাবেন গাছের ডালে, অক্ষমতার লজ্জায় হেসে খান্ খান্ হয়ে পড়বেন গড়িয়ে।

কিন্তু এসব নাটুকেপনা ভালো লাগবার মত মনের অবস্থা এখন নিখিলের নয়।

ভালো অবশ্য কোনো দিনই লাগে না। চ্যাটার্জ্জি গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ নিতান্তই চ্যাটার্জ্জি সাহেবের খাতিরে। এই আর একটি যথার্থ শ্রদ্ধা করবার যোগ্য মানুষ দেখেছে নিখিল, যাঁকে প্রায় তার বাবার মতই আদর্শ চরিত্র বলে মনে হয়।

আজন্ম খদ্দরধারী নিরীহ অধ্যাপক। তাঁর নামের পিছনে 'সাহেব' শব্দটা জুড়ে দিয়ে সমাজে চালিয়ে বেড়াতে পারার সমস্ত ক্রেডিট্‌টাই মিসেস চ্যাটার্জ্জির।

অধ্যাপকের কাছে যারা আসে, তাদের পক্ষে চট করে অধ্যাপক পত্নীকে চেনা সম্ভব নয়, কিন্তু তলে তলে কোথায় কি মন্তর চলে—স্বয়ং অধ্যাপককেই শেষে চিনতে পারে না তারা। বেড়াতে আসবার সময়টা বেছে বেছে নির্দ্দিষ্ট করে রাখে অধ্যাপকের অনুপস্থিতির সময়টা।

নিখিল ঠিক সে দলের নয় বলেই বোধকরি বলাকা দেবী ধরে ফেলেছেন ওর আর একটা রীতিমত দুর্ব্বলতার দিক—ওর অতিমাত্রায় চক্ষুলজ্জা আর সূক্ষ্ম ভদ্রতা বোধের দুর্ব্বলতা।

নিখিল ইসারায় নিমন্ত্রণে অনিচ্ছার কথা জানাবার চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু শৈলদি ততক্ষণে রান্নাবাড়ীর ওদিকে চলে গেছেন। মিসেস চ্যাটার্জ্জি বললেন—আচ্ছা তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমি শাড়ীটা বদলে আসি।

—কেন বেশ তো আছেন। মন্দ কি শাড়ীটা?

—বাঃ, তা' বলে ভদ্রলোকের বাড়ী যাবার মত নয়।

বলে প্রিণ্টেড্‌ শাড়ীখানা ছেড়ে বোধকরি ঢাকাই পরতে গেলেন।

শৈলবালা রান্নাঘর থেকে কি একটা কাজে ঘুরে এদিকে আসতে গিয়ে নিখিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—ভালো কথা, কাল থেকে জিগ্যেস করাই হ'ল না কথাটা, মেয়েটা কে রে নিখিল ?

নিখিল মৃদু হেসে বললে—'মেয়েটা' কি গো শৈলদি ? বলুন মহিলাটি ? না আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। এটিকেটের ধার ধারেন না, সভ্য ভাষা ব্যবহার করেন না—অচল অচল।

—অচল বটে, কিন্তু মেকি নয় বুঝলি ? এ মেকি টাকাটিকে কোথা থেকে জোটালি বলতো ?

—প্রফেসর অরুণ চ্যাটার্জ্জির গল্প করেছিলাম না ? তাঁর স্ত্রী।

—প্রফেসরের বৌ ? বয়স কত ? খুকীর মত নেচে বেড়াচ্ছে !

—সর্ব্বনাশ করেছে ! আবার আপনি ভদ্রতার বাইরে চলে যাচ্ছেন শৈলদি, মেয়েদের বয়সের কথা জানতে আছে ?

—কি জানি বাপু, আমাদের ওসব চোখে সয়না। ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের বৌ রং মেখে সং সেজে বেড়াবে কি ? ছিঃ !

নিখিল উত্তর দেবার আগেই বলাকা দেবী সেণ্ট স্নো আর পাউডারের একটা সম্মিলিত সুবাস বহন করে হালকা হাওয়ার মত ভেসে এলেন।

—কই হ'ল তোমার ? উঃ চায়ের অভাবে তো মাথা ধরে উঠলো। চলো দেখি, ভাগ্যে কি জোটে !—বলে শৈলদিকে প্রায় আড়াল করে নিখিলের গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁরও চোখে সয়না নেহাৎ বাজেমার্কা বুড়ি শৈলদির সঙ্গে নিখিলের এমন সহজ হাস্যালাপ। এই বুড়িটাকেই বরং মাসী পিসি বললে কোন ক্ষতি ছিল না, ওকে আবার 'দিদি' ! রুচিকে ধন্যবাদ !

কী মুরুব্বিয়ানা চালের কথাবার্ত্তা বুড়ির, শুনলে হাড় জ্বলে যায় !

আশ্রমের হাতার মধ্যেই একটেরে মিহির ডাক্তারের আড্ডা। উঁচু-পোতার উপর খড়ের ছাউনী দেওয়া নীচু বাংলো। ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে ছাউনীতে হাত ঠেকে, জানলা দরজারও যে বিশেষ বাহুল্য ব্যবহার আছে এমন নয়, কিন্তু বারান্দাটি চমৎকার।

বেশ কয়েকটি সিঁড়ি উঠে সামনেই কাঠের রেলিং-ঘেরা লাল সিমেণ্টের চওড়া বারান্দা, যতদূর দৃষ্টি চলে উদার উন্মুক্ত মাঠ। দৃষ্টি কোনখানে ব্যাহত হয় না। দূরাঞ্চলে ঘন শালবন আকাশের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গেছে।

এই বারান্দায় খানকয় বেতের চেয়ার পেতে ডাক্তার অতিথি যুগলের প্রতীক্ষা করছিলেন। ছোকরা ডাক্তার, অবিবাহিত মানুষ, কিন্তু অবিবাহিতদের মত বাউণ্ডুলে নয়, সৌখিন ফিটফাট।

আসবাবপত্র বেশী নয়, খুব যে মূল্যবান এমনও নয়, তবে রুচিসম্মত। বেশভূষাতে আশ্রমবাসীর কৃচ্ছ্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই।

প্রথম দিন এসেই তিনি দরাজগলায় জানিয়ে দিয়েছিলেন—'সেবাশ্রমের' চাকরী নিয়ে এসেছি বলেই যে সেবানন্দ স্বামী বনে বসে থাকবো সেটি মনে করবেন না বিভূতিবাবু। আপনাদের ওসব কম্বলাসন আর কচুভক্ষণের মধ্যে আমি নেই। আমি আর আমার চাকর রাঁধবো বাড়বো খাবোদাবো, আর মাঝে মাঝে ব্যাগ বগলে করে কে কোথায় আপনার বিনিচিকিৎসায় মরছে তার হিসেব নিয়ে আসবো—ব্যস্।

বিভূতিবাবু সহাস্যে প্রশ্ন করেছিলেন—চিকিৎসাটা কে করবে—আমি? আপনি শুধু হিসেব নিয়েই খালাস?

—চিকিৎসা? চিকিৎসার আবার আছে কি মশাই? দারিদ্র্য রোগের দাওয়াই যদি আমার ষ্টকে থাকতো তাহলে কি আর এই অজ পাড়াগাঁয় মরতে আসতাম? যখন দেখি—বেটা-বেটিদের চালে খড় নেই, ঘরে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, রোগে পথ্যি নেই, অথচ কুইনিন ঠুসে ঠুসে পেটজোড়া পীলেটিকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছেটুকু আছে ষোলো আনা, তখন বাসনা হয় দিয়ে দিই একেবারে মোক্ষম দাওয়াই ঠুকে। কি করবো, আইনের দড়াদড়িতে হাত-পা বাঁধা যে।

বলাবাহুল্য নবনিয়োজিত ডাক্তারের অভিনব মতামত শুনে বিভূতি বাবু ভয় খাননি। এ বোধটুকু তাঁর ছিল—প্রাণে দরদ না থাকলে গলায় এমন দরাজস্বর ফোটে না।

—এই যে আসুন, আপনাদের নেমন্তন্ন করে আমার তো মশাই পিত্তি পড়ে গেল—দুই হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রিতের সম্বর্দ্ধনা করলেন ডাক্তার।

—বিলক্ষণ, আপনাদের দেশে এসে আমারও—মিষ্টিহাসি হেসে মিসেস চ্যাটার্জ্জি বারান্দায় উঠে এসে একখানি চেয়ার দখল করে বসলেন। বললেন—ওঃ! কী বলে—'ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা' দেখে যেন অসাড় প্রাণে চেতনার সঞ্চার হলো! দেখো তো নিখিল, কী সুন্দর একখানি বাঙ্‌লা বললাম? তোমাদের প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি বলেন,—আমি নাকি মোটেই ভালো বাঙ্‌লা বলতে পারি না।

মিহির সকৌতুকে বলে—কেন, তাঁর এমন অদ্ভুত ধারণার কারণ?

—কি জানি! আমার সম্বন্ধে কতো লোকের যে কতো অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে!

—তাই নাকি!···আচ্ছা ধূমায়িত চায়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে অপরের অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণার গল্প উপভোগ করা যাবে। মনে হচ্ছে বেশ

উপভোগ্যই হবে। নিখিলবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন যে? গলবস্ত্রে অনুরোধ করতে হবে নাকি? বসে পড়ুন? হাত চালান?

মিহির ডাক্তার সকলেরই বন্ধুলোক। বিভূতিবাবুর সঙ্গে এবং নিখিলের সঙ্গে একই সুরে কথা কইতে তাঁর বাধে না।

আহারের আয়োজন নিতান্ত সামান্য নয়, রসনার সঙ্গে রসালাপ চললো বেশ কিছুক্ষণ। এবং মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞতা বোধ করল নিখিল এই দেখে যে ঘুণাক্ষরেও একবার বিভূতিবাবুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না ডাক্তার।

—ভারী খুশী হলুম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। কাল থেকে তো এসে পর্য্যন্ত হাঁফিয়ে উঠেছিলাম।

বলাকা দেবীর মধুর সার্টিফিকেটের উত্তরে ডাক্তার কিছু একটা বলার আগেই নিখিল বলে উঠলো—ডাক্তারবাবুর আর একটা গুণের কথা শোনেন নি মিসেস চ্যাটার্জ্জি—উনি শুধু ডাক্তারই নন, একজন লেখকও।

বলাকা দেবী ভুরু কুঁচকে অথচ সহর্ষে বলে ওঠেন—লেখক? অর্থাৎ?

—লেখক! মানে আর কি বই লেখেন! গল্প উপন্যাস—

—ও! নভেলিষ্ট! তাই নাকি? এমন মূল্যবান খবরটি আমার অজানিত রাখছিলেন ডক্টর গুপ্ত?…ডক্টর গুপ্ত!…পুরো নাম?

নিখিল বলে—মিহির গুপ্ত!…তবে সাহিত্যের আসরে ও নামে পরিচিত নয়। ছদ্মনামেই পরিচয়! নামটা হচ্ছে 'বিক্রমাদিত্য!'

—ছদ্মনাম কেন? বলাকা দেবী যেন অবাক হয়ে যান।

—সাহসের অভাব আর কেন!—ডাক্তার হেসে ওঠেন।

—"বিক্রমাদিত্য"—"বিক্রমাদিত্য"—ও—ভ্রূ কুঁচকে বলাকা দেবী স্মরণ করতে চেষ্টা করেন—আপনারই লেখা "নীল জ্যোৎস্না" না?

ভেবে চিন্তে একখানি বইয়ের নাম মনে আনা লেখকের পক্ষে অবশ্য খুব বেশী গৌরবের নয়। ডাক্তার কিঞ্চিৎ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসেন। কিন্তু এর চাইতে গৌরব ক'জনার ভাগ্যেই বা ঘটে?

পাঠক সম্প্রদায়ের—বিশেষ করে পাঠিকা সম্প্রদায়ের মধ্যে বারো আনা অংশ তো লেখকের নাম দেখে বই পড়ার বা বই পড়ে লেখকের নামটুকু মনে রাখার কষ্টস্বীকার করতে নারাজ। ঘুমের সহায়ক হিসেবে যাঁরা বই হাতে করেন, তাঁদের কথা বাদ দিলেও বলাকা দেবীর সংখ্যাও কম নয়।

ফ্যাসানের খ্যাতিরে বিখ্যাত লেখকের লেখা কিছু কিছু পড়ে রাখা দরকার, আলোচনা চালাতে হলে কথার পিঠে কইতে পারার মত কিছু কথা শিখে রাখা দরকার এই হিসেবেই যা কিছু করা।...যেমন "মন্বন্তর" পড়েন নি? আছেন কোথায়?..."উদয়াচল" দেখেন নি? লোকালয়ে মুখ দেখাবেন না।..."নবান্ন" দেখে এলেন? বাস্তবিক মার্ভেলাস।

সৌভাগ্যের বিষয় "নীল জ্যোৎস্না" সম্প্রতিই পড়ে এসেছিলেন বলাকা দেবী। গল্প চালাবার একটা সুযোগ পেয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন—বলতে হয় এতক্ষণ? সাহিত্যিক মানুষের সঙ্গে কথা কইছি ভেবে সাবধানে কথাবার্ত্তা কইতাম।

—সাহিত্যিক তো আর একটা কিম্ভূত জীব নয়? মিহির গুপ্ত হেসে ওঠেন।

—আমাদের কাছে কিম্ভূত না হোক অদ্ভুত তো বটেই। আচ্ছা কি করে আপনারা লেখেন বলুন না—আবদেরে খুকীর ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে ফ্যালফেলে দু'টি চোখের দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের উপর তুলে ধরলেন ভদ্রমহিলা।

—ও আর কি শক্ত। চেষ্টা করলেই হয়। ধরুন—আপনারা

যেমন একটা পশমের তাল নিয়ে সামান্য দুটো কাঁটার সাহায্যে ঘরের পর ঘর বাড়িয়ে মাফ্‌লার সোয়েটার মোজা টুপি কত কি গড়ে তোলেন, এও একরকম তাই। ভাবের তাল থেকে কথার জাল বুনে বাড়িয়ে বাড়িয়ে গল্প গড়ে তোলা এই আর কি। তফাতের মধ্যে আমাদের একটা মোটে যন্ত্র।

—আর ব্রেণের খাটুনীটা বুঝি কিছু নয়?

—হ্যাঁ ওই একটু বাজে খরচা আছে বটে—ডাক্তার মুচ্‌কি হাসলেন।

—উঃ আমার তো মনে করলে ভয় করে, একটা চিঠি লিখতে গেলেই মাথায় বজ্রাঘাত।

—সেটা মাথার গুণ। ডাক্তার আর একবার মুচ্‌কি হাসলেন।

—সম্প্রতি আর কি লিখছেন ডাক্তারবাবু? নতুন কোনো উপন্যাসে হাত দিয়েছেন না কি?

নিখিল প্রশ্ন করলে।

ডাক্তারবাবু মুখটা ঈষৎ পাশ ফিরিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করছিলেন—জ্বালিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উত্তর করলেন—কি বললেন—নতুন কিছু লিখছি কি না? কই আর লিখলাম মশাই, প্লট কই?

—বলেন কি? বর্ত্তমান যুগে আবার প্লটের অভাব?

ফোড়ন কেটে উঠলেন বলাকা দেবী।

বাঙালী তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসে আছে সত্যি, কিন্তু বাংলার মেয়ে আজও তার প্রপিতামহীর কিছুটা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে নিজের অতি আধুনিক স্বভাবের ফাঁকে ফাঁকে।

অপরের কথায় ফোড়নকাটা তাঁর একটি স্বভাব। কাজেই আলোচনার

মোড়টা ঘুরে যায় তাঁর দিকে, নীরব শ্রোতা নিখিল অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকে সুদূরবিস্তারি খোলা মাঠের পানে। বাংলাদেশ বটে—তবু বাংলার সেই সুজলা সুফলা রূপ এ অঞ্চলে কম। রুক্ষ প্রান্তর···দৃষ্টি কোথাও ব্যাহত হয় না।

আঁকা ভ্রূ বাঁকিয়ে রঞ্জিত ওষ্ঠাধরের রক্তিম হাসিটুকু মুছে একটু করুণ রসের প্রলেপ লাগিয়ে বলাকা দেবী আবার বলে উঠলেন—এই যে—চতুর্দ্দিকে অভাব অভিযোগ দুঃখ দারিদ্র্য হাহাকার, এই যে মারী-মন্বন্তরে তের শো পঞ্চাশের শোচনীয় লীলা—এর মধ্যে আবার প্লটের অভাব? এই তো দিন এসেছে আপনাদের—

বাধা দিয়ে শব্দ করে হেসে ওঠেন মিহির ডাক্তার—তা যা বলেছেন, এই তো দিন এসেছে আমাদের। 'কিউ' 'কণ্ট্রোল' আর 'কালো-বাজারে'র মত খুচরো ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিলেও তের শো পঞ্চাশই আমাদের অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবে। শেয়াল কুকুরের মত কতকগুলো লক্ষীছাড়া লোক অন্নজলের অভাবে রাস্তায় পড়ে মরে গেল বটে—কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকদের কিছুকালের অন্নজলের সংস্থান করে দিয়ে গেল।

—তার মানে?

কথাটার নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে একটু মুস্কিলে পড়ে যান মিসেস চ্যাটার্জ্জি।

—মানে তো একটু আগে আপনিই বলে দিলেন—আজকালকার দিনে আবার প্লটের অভাব? ধরলেই হ'ল কলম, কালির খরচা পর্য্যন্ত নেই। সেই বঞ্চিত হতভাগ্যদের বুকভাঙা রক্তে কলমটা একবার ডুবিয়ে নিতে পারলেই হ'ল, সাদা কাগজ আপনিই রেঙে উঠবে। কে কত বীভৎসতা ফুটিয়ে তুলতে পারে, কে কত নোংরামীর সৃষ্টি করতে পারে—লেখক মহলে

তারই তুমুল প্রতিযোগিতা। মেলার বাজারের পাঁপর ভাজার মত পড়তে পাচ্ছে না, বাদাম তেলেই ভাজুন আর রেড়ির তেলেই ভাজুন, চলে ঠিকই যাচ্ছে।

—তা হলে আপনি বলতে চান এসব লেখা ঠিক নয়?

—কে বলছে ঠিক নয়? ঠিকই তো, শুধু আমি পারিনে, আমার অক্ষমতা।

—কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাহিত্যিকরাই তো দেশকে বাঁচিয়ে তুলেছে জাগিয়ে তুলেছে, জাতিকে দিয়েছে নতুন প্রেরণা নতুন আলো—ফুলের মধু চাঁদের আলোর দিন তো আর নেই! এখনো কি লোকে প্রেমের স্বপ্ন দেখবে?

আলগোছে শিথিল খোঁপাটাকে একটু চাঙ্গা করে দেন বলাকা দেবী দুটি বাহুর আলস্যমন্থর লীলায়িত ভঙ্গিতে। শিথিল কবরী পিঠ ও ঘাড়ের ঠিক সন্ধিস্থলে যাতে 'ন যযৌ ন স্থতৌ' অবস্থায় আটকে থাকে—স্থানচ্যুত না হয়।

মিহির ডাক্তার হয় তো এইখানেই একটু মুচ্‌কে হেসে থেমে যেতেন, কিন্তু বলাকা দেবীর উচ্চাঙ্গের কথাগুলো কানে যেতেই বোধকরি অন্যমনা নিখিল চকিত হয়ে উঠেছিল, তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ডাক্তারের মুখের পানে উত্তরের আশায়।

ডাক্তার এবার একটু গম্ভীর হয়ে ওঠেন পরিহাসের ভঙ্গী ত্যাগ করে, ঈষৎ চড়া গলায় বলেন—হ্যাঁ, জাতিকে গড়ে তোলবার ভার সাহিত্যিকেরই বটে, কিন্তু তারও তো একটা অধিকার থাকা চাই। উড়তে শিখলেই আরশোলা পাখী হয় না। কলম ধরলেই সাহিত্যিক হয় না। আমার কলমে হাল্কা প্রেমের গল্পের বেশী যদি না ফোটে তা'তে হাত পা ছুঁড়বার কি আছে? একটা ভাল গল্প গড়ে তুলতে পারি তাই ঢের, জাতি

গড়বার বায়না নেব কোন সাহসে? আর গড়া কাকে বলে? আমরা যে কত বঞ্চিত, কত অধঃপতিত, কত লোভী, কত শয়তান, কত দীনদুঃখী কঙ্কালসার, তারই বিশদ ছবি আঁকার নাম জাতিগঠন? পেটের দায়ে ভদ্রঘরের মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে নেমেছে, কাপড়ের অভাবে মানুষ কবরের কফিন খুঁড়ছে—এই খবরটা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রং দিয়ে চড়াদামে বাজারে ছাড়তে পারার নাম নতুন আলো আনা?

বাঙালী ছাড়া আর কেউ বাংলা পড়ে না এই রক্ষে। ভেবে দেখুন দিকিন, আমাদের আজকের সাহিত্য যদি পৃথিবীর অন্য সভ্যদেশে অনুবাদ হ'তো, কি পেতো তারা? ইনিয়ে বিনিয়ে দুর্দ্দশার কাঁদুনী গাইতে লজ্জা করে না? যে দুর্দ্দশার মূল আমাদের নিজের লোভ আর নিজের পাপ?

—আর বিদেশীদের অত্যাচারটা বুঝি কিছু নয়?

—কিছু তো বটেই, কিন্তু 'কিছু'ই সম্পূর্ণ নয়। যাদের অত্যাচারে এই মন্বন্তর তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মালিত করবার জন্যে যদি কলম ধরতে চান সেটা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। আর যাই হোক—বাংলা গল্প উপন্যাস তা'রা পড়ে না, এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। লাভের মধ্যে কি হচ্ছে জানেন? এই একঘেয়ে বীভৎসতার কাহিনী শুনতে শুনতে হৃদয়বৃত্তিগুলো ক্রমশঃ অসাড় হয়ে যাচ্ছে আমাদের। চাঁদের আলো পাখীর গানের কথা দূরে থাক, প্রেম ভালবাসাও যেন হাস্যাস্পদ বস্তুর মধ্যে গণ্য। বর্ত্তমান তো গেছে—ভবিষ্যতও নেই, সেখানে কোটি কোটি অর্দ্ধনগ্ন কঙ্কালসার নরনারী কালো কালো ছায়া মেলে চব্বিশ ঘণ্টা ক্ষুধার তাড়নায় হাহাকার করে বেড়াচ্ছে।...আত্মিক ক্ষুধা। মানসিক ক্ষুধার মত সূক্ষ্মবস্তুতে আর কুলোচ্ছেনা লেখকদের, স্রেফ্ পেটের ক্ষুধা আর দেহের ক্ষুধা।

ফাঁপরে পড়ে যান বলাকা দেবী, সত্যিই কিছু আর সাহিত্যিক সমস্যা

নিয়ে তর্ক করার ভূতে ধরেনি তাঁর। গল্প চালাবার জন্যেই দু' একটা কথা বলা, বড় বড় কথা নিয়ে একটু বাহাদুরী নেওয়ার সখ এই—কিন্তু মিহির ডাক্তারের কথাগুলো যেন আরো বড় বড়।

বাগিয়ে উত্তর দেওয়া মুস্কিল।

তাই বলে তো আর রণে ভঙ্গে দেওয়া যায় না?

ভেবেচিন্তে আর একটি কূট প্রশ্ন করেন—কিন্তু এ সবও তো আছে সংসারে? এই স্থূল ক্ষুধা? এই অদম্য পিপাসা? এ:কে তো আর চোখ বুজে অস্বীকার করা যায় না?

—হয় তো যায় না। কিন্তু আছে বলে সেটাই বড় সত্য, তার উর্দ্ধে কি আর কিছুই নেই? গাছের শিকড়টা আছে বলেই তার ফুল ফল সব মিথ্যে? শিকড়টাই আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে? রাস্তার নীচে ড্রেনের ময়লাও তো আছে—তাই বলে কি তা'কে ঘুলিয়ে তুলে চলার পথ পঙ্কিল করে তুলবো? আপনারা বাস্তববাদীরা হয় তো বলবেন—'আমাদের তাই ভালো'। বলুন। আমি সেই পুরনো কালের রঙিন চশমা দিয়েই পৃথিবীটাকে দেখবো।

—মানে—শুধু সেই পুঁজিবাদী ধনিকসম্প্রদায়কে নিয়েই লিখবেন? দেশের নগ্ন নিরন্ন বুভুক্ষুদের দিকে ফিরে চাইবেন না?

আলগোছে একবার মুখের ঘাম মোছার ছলে পাউডারে ডোবানো রুমালখানা মুখে গলায় ঘসে নিয়ে, বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে ডাক্তারের মুখের পানে চেয়ে থাকেন মিসেস—বোধকরি সেই নিরন্নদের জন্য একটু করুণা ভিক্ষার আশায়।

হঠাৎ রীতিমত হেসে ওঠেন ডাক্তার—নাই বা চাইলাম? আপনারাই তো রয়েছেন চাইতে। আমাদের মতো দু'একটা হতভাগা যদি নিজের কলম কাগজ নিয়ে একপাশে বসে হিজিবিজি করে কি এসে যাচ্ছে দেশের?

কিন্তু আমাকে যে এবার উঠতে হয় নিখিলবাবু, গোটাকতত রোগী মরেও মরছে না—দেখে আসি একবার কবে নাগাদ রেহাই দেবে।

এরকম স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের পর সত্যিই কিছু আর বসে থাকা চলে না। নিখিল উঠে পড়ে, অগত্যা বলাকা দেবীও—কিন্তু অনিচ্ছামন্থর গতিতে। গিয়েই তো সেই শৈলদির মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে হবে? এ তবু কিছুক্ষণ কাটানো গেল মন্দ নয়। ডাক্তার লোকটি খাসা, কথাবার্ত্তাগুলো একটু ধারালো বটে কিন্তু চিত্তাকর্ষক।

আবার একবার দেখা করবার জোরালো ইচ্ছে নিয়ে উঠে আসতে হয়।

এ বাড়ীর চৌকাঠের কাছে এসে মিসেস চ্যাটার্জ্জি হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠেন—ডাক্তারবাবু লোকটি কি রকম বল দিকিন, এদিকে তো খুব লম্বা লম্বা কথা কইলেন—কিন্তু আসলে বোধ হয় একেবারে হার্টলেস্? পেসেণ্টদের উপর যে রকম অবহেলা—

—অবহেলা!—নিখিল কি একটা বলতে গিয়ে একটু হেসে থেমে গেল।

দুপুরবেলা নিখিলকে ধরে নিয়ে গেলেন নৃপেনবাবু অফিস ঘরে। জরুরী কথাবার্ত্তা পরামর্শের ব্যাপার।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রত্যেক বিভাগ দেখে ঘুরে বেড়ান। লীলা, বেলা, মাধবী, যোগমায়া, উমাশশী—অনেকের সঙ্গেই দু'চারটী বাক্য বিনিময় করেন—জেনে নেন মিহিরগুপ্তর যাবতীয় তথ্য। কখন উপস্থিত থাকেন কোয়ার্টার্সে, কখন দেখেন আশ্রম হাসপাতাল বা 'স্বাস্থ্যভবনে'র রোগীর দল, কখন বাইরের।

বৈকালিক চা পানটাও তাঁর আড্ডায় হ'লে আবহাওয়াটা কি রকম করে তোলা যাবে মনে মনে তার খসড়া ভাঁজতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন শাড়ীটার সঙ্গে কোন ব্লাউসটা ম্যাচ্ করবে তারও হিসাব করা হয়।

অনেক রাত্রে···হ্যারিকেন লণ্ঠনের শিখাটা উজ্জ্বলতর করে দিয়ে বুকের নীচে বালিশ রেখে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে চিঠি লেখেন।

দীর্ঘচিঠি।

লেখেন···তোমায় ছেড়ে এসে কিন্তু ভয়ানক মন কেমন করছে, মনে হচ্ছে ছুটে চলে যাই। কী মুস্কিল বল তো? কেন যে এলাম! আশ্রম দেখলাম···নিখিল যতটা বলেছিল ততটা না হলেও বেশ। শৈলদির— অর্থাৎ সুপারভাইজারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না আমায়, অথচ আমার করছে তোমার জন্যে মন কেমন—কি করি?

বাধ্য হয়ে আরো দু' চারদিন থাকতে হবে···তারপর নিখিলের জমিদারী ও দেশের বাড়ীঘর না দেখিয়ে কি ছাড়বে নিখিল?···তোমার জন্য উদ্বিগ্ন থাকছি। পত্রপাঠ উত্তর দেবে ও সাবধানে থাকবে। নিয়মিত চিঠি না দেওয়া মানেই আমায় শাস্তি দেওয়া···বুঝবো ঝগড়া করে চলে এসেছি বলে···তোমার···।

আরো একটা ঘরে আলো জ্বলছিল—মোমবাতির মৃদুস্নিগ্ধ আলো। বাতি জ্বালিয়ে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে চিঠি লিখছিল নিখিল।

ছোট্ট চিঠি।

"তুমি ভাবছো কলকাতা থেকে চলে এসে খুব মন কেমন করছে তোমার জন্যে? বয়ে গেছে। বরং স্বস্তিতে আছি—হপ্তায় তিন দিন করে হ্যারিসন রোড ভাবানীপুর ছুটতে হবে না এই ভেবে। থাকলেই তো সেই টেলিফোনে ডেকে ডেকে অস্থির করতে? বেশ আছি।··· ইতি 'শ্রীযুক্ত আমার আমি'।"

সুরকী ফেলা লাল রাস্তাটা শেষ হয়ে যেখানে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, তা'র ঠিক কোণটায় দাঁড়িয়ে থাকলে সুদূরাগত সাইকেলে আরোহীটিকে বেশ কিছুক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

নিজেকেও দ্রষ্টব্য করে তোলা যায় পারিপাট্যে ও অপারিপাট্যে, উড়ন্তচুলে ও উদাস ভঙ্গিতে। কাছাকাছি এসেই আগন্তুক ব্যক্তি 'ঝড়াং' করে সাইকেলটা থামিয়ে নেমে পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করেন—কি ব্যাপার! এখানে দাঁড়িয়ে?

—এমনি। আপনাদের আশ্রমের আবহাওয়ায় একলা একলা প্রাণ হাঁপিয়ে আসে যেন। আলাপ করবার মত একটা লোকই দেখলাম না।

—কেন শৈলদেবীর সঙ্গে আলাপ হয়নি আপনার?

সাইকেলটার উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়ান ডাক্তার। লম্বা পাতলা চেহারা, সাদা পায়জামা ও অ্যাস্‌কালার পপ্‌লিনের হাফসার্ট পরা। প্রতিকূল বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আসার জন্যে আঁচড়ানো চুল বিপর্য্যস্ত। উজ্জ্বল যৌবনদীপ্ত মুখ।

এই সজীব প্রাণবন্ত দৃপ্ত যৌবনশ্রীর সঙ্গে তুলনা না করে পারেন না বলাকা দেবী প্রফেসর চ্যাটার্জ্জির সুবিস্তৃত টাকের নীচে বালকসুলভ কমনীয় মুখ আর সন্দেশের পুতুলের মত থস্‌থসে গড়নের।

কিন্তু সংসারে এত লোক থাকতে প্রফেসরের সঙ্গেই বা ডাক্তারের তুলনা করবার হেতু কি? তবু তুলনার ফলে মুহূর্ত্তের জন্য বিমনা হয়ে যান মিসেস চ্যাটার্জ্জি। বয়সের তফাৎ খুব বেশী কি? চ্যাটার্জ্জির কতই বা বয়স সত্যি? আটত্রিশ পূর্ণ হয়নি এখনো।

আর মিহির গুপ্ত? দশবছর ধরে যে ডাক্তারী করে আসছে—সত্যিই কিছু আর খোকা নয় সে? এই তো—সেদিন নিজ মুখেই বললে—"মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে দু'চার বছর এলোমেলা করেই কেটে গেল—তারপর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চাকরী নিয়ে এলাম এখানে—ঝগড়াঝাঁটি করে বছর দুই পর্য্যন্ত টেনেছিলাম কাজটা—শেষ পর্য্যন্ত পোষাল না ছেড়ে দিলাম। অবশেষে এই 'সেবাশ্রম'। তিন বছর ধরে এখানে শিকড় গেড়ে বসে আছি দেখে নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে এক এক সময়। হয় তো কোন দিন কেটে পড়বো।"

ভাগ্যিস তারপরে আসেন নি বলাকা দেবী!

ডাক্তারবাবু আর একবার বলেন—চমৎকার মানুষ এই শৈল দেবী। ভাল করে আলাপ করে দেখলে বুঝতে পারবেন।

আবার সেই শৈল দেবী!

ভারী বিরক্ত হয়ে ওঠেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি।

কালো শুঁটকো এক বুড়ি তা'কে নিয়ে এত নাচানাচি কেন রে বাবা? পদমর্য্যাদা তো কতো—আশ্রম পরিচর্য্যাকারিণী! নিখিলের সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়াতে এসেছে বলে বলাকা দেবী কি ঐ শৈল ফৈলর সমপর্য্যায়ে পড়ে গেছেন নাকি? রূপে আর রঙে ঝিলিক মেরে বলাকা দেবী যখন ব্যারিষ্টার বিরাম সেনের সম্ভ্রান্ত চেহারার সিডানবডি খানা থেকে ঠিকরে নেমে পাক্‌খেয়ে ঢোকেন মেট্রো-লাইটহাউসে, বিলিতি কফিখানায় বসে অসংখ্য শ্বেতবর্ণের মাঝখানে সরু ছুঁচলো গলায় 'ব্যেরা' বলে ডাক দেন, তখন ওই শৈল বুড়ি যদি দেখে, দশ হাতের কাছাকাছি আসতে সাহস করবে?...

দুঃখের বিষয় বলাকা দেবীর সে ঐশ্বর্য্য এদের দেখাবার উপায় নেই, আর কবেই বা দেখাবেন? বিরাম সেন এখন নতুন বিয়ের নেশায়

মস্‌গুল। ছেলেগুলো যতদিন আইবুড়ো থাকে বেশ থাকে, বিয়ে হলেই অভদ্র হয়ে গেল।···

এই নিখিলই কি আর পুঁছবে? যে রকম ঘন ঘন ভবানীপুরে যাতায়াত করছে—কে জানে কোথায় প্রেমে পড়ে গেছে কি না। বলে 'কাজ আছে', 'প্রেমকরা' ছাড়া এসব বয়সের ছেলের অত জরুরী কাজ আর কি থাকতে পারে? অমন নামহীন জরুরী কাজ?···নিশ্বাস পড়ল একটা।

অবশ্য এত কথা ভাবতে খুব বেশী সময় লাগে না বলাকা দেবীর, দীর্ঘনিশ্বাসটা প্রায় মিহির ডাক্তারের কথার পিঠেই পড়ে।

—কী হল? দীর্ঘনিশ্বাস কিসের।

শৈল দেবীদের সঙ্গে আমার ঠিক—মানে—মিশে সুখ হয় না। বড় বেশী গ্রাম্যভাবাপন্ন, বাইরের খবর কতটুকুই বা রাখেন ওঁরা, কি নিয়ে কথা চালাবো বলুন?

—কিন্তু উনিও একজন রীতিমত বিদুষী মহিলা, ডিগ্রির ছাপ হয়তো নেই, কিন্তু যথার্থ বিদ্যা সত্যিই আছে। এত সব জানেন বোঝেন দেখলে অবাক লাগে!

—হবে হয় তো।—বলে অভিমানাহত করুন মুখখানি ঈষৎ ফিরিয়ে ধরা গলায় বলেন—আপনার সঙ্গে গল্প করে একটু সুখ পাই, কিন্তু আপনাকে তো পাওয়াই শক্ত। কাজের লোক আপনারা।···ভালো লাগছে না, চলে যাবো কাল।

—কোথায় যাবেন? কলকাতায় না নিখিলের—

চলে যাওয়ার সংবাদটা এত হাল্‌কাভাবে নেওয়ার জন্যে আরো মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা। একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেন—কোথায় যাবো জানিনা, ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাবে।

—বলেন কি একেবারে ভাগ্যের হাতের পুতুল? আচ্ছা আপাতত ভাগ্য আপনাকে নিয়ে গিয়ে ফেলছে এই গরীবের আস্তানায়। চলুন আমাকে এক পেয়ালা চা তৈরী করে খাওয়াবেন। বড় টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, নিজে নিজে ষ্টোভ জ্বালতে পারিনে আর।

'মেঘ না চাইতে জল'।

পুলক গোপন করে সমানভাবে উদাসভাব মুখে বজায় রেখে মিসেস চ্যাটার্জ্জি এইটুকু জানান, এই পরিশ্রমটুকু করতে তাঁর আপত্তি কিছুই নেই, তবে খাদ্যযোগ্য হবে কি না তার গ্যারান্টি দিতে পারেন না। কারণ বাড়ীতে তিনি ষ্টোভে হাতই দেন না কখনো।

—বলেন কি? আপনার নিজের বাড়ীতে চাকরে চা তৈরি করে?

—চাকর নয় বেয়ারা।—ভুল সংশোধন করে দেন বলাকা দেবী।

—ওই হল। ভাত নয় অন্ন। কিন্তু কোন্ দুঃখে? বেচারা মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি! তাঁর দুঃখে বিগলিত হচ্ছি আমি।

—মজার কথা এই—তাঁর নিজের সুখ-দুঃখ বোধের বালাই-ই নেই। তিনবেলা উপোস করিয়ে রাখলে বলবেন না—'খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না কেন'? নির্ব্বিকার পরমহংস।

—সত্যি নাকি? ডাক্তার প্রশ্ন করেন কৌতূহলাক্রান্ত স্বরে।—বেশ লোক তো!

—বেশ বটে। তবে শুনতেই বেশ, নিয়ে ঘর করতে হলে পাগল হয়ে যেতেন। যদি বলি—নাঃ থাক্ তাঁর কথা তুললে মেজাজের ঠিক থাকে না আমার। তার চেয়ে চলুন আপনাকে চা খাওয়াই।

—সে তো খাওয়াবেনই। তার সঙ্গে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির গল্প শোনাবেন চলুন। আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে—"স্মরণ মনন আর আলোচন"ই বিরহের প্রধান ঔষুধ।—ডাক্তার হেসে উঠে সাইকেল ঠেলতে সুরু করেন।

—ছাই। বিরহে একেবারে মরে যাচ্ছি আমি।

কথাবার্ত্তার স্তর এত অন্তরঙ্গতায় এসে পড়ায় দস্তরমত খুশী হয়ে ওঠেন বলাকা দেবী।

—সে আপনি চাপা দিতে চেষ্টা করলেই বা শুনবো কেন? 'তাঁর কথা তুললে মেজাজ বিগড়ে যায়'—এ যে নিদারুণ অবস্থা। উচিত ছিল তাঁকে শুদ্ধু টেনে আনা।

সাইকেলটা সিঁড়ির গায়ে ঠেসিয়ে রেখে বারান্দায় উঠে পড়েন ডাক্তার।

—এই দেখুন এই মীটসেফের মধ্যে আমার যথাসর্ব্বস্ব। ওর ভেতর থেকে ঘর গেরস্থালীর সব পাবেন। তিন পেয়ালা চা করুন—তু' পেয়ালা আমার, এক পেয়ালা আপনার—হাসছেন যে? কী ভীষণ টায়ার্ড হয়ে পড়েছি জানেন? ছাব্বিশ মাইল রাস্তা সাইকেলে পাড়ি। হটওয়াটার ব্যাগ চাপাতে হবে পায়ে।

—আচ্ছা এত খাটেন কেন বলুন তো? কতই বা দিতে পারে এখানকার লোকে?

—দিতে? হো হো করে হেসে ওঠেন ডাক্তার—উল্টে আমাকেই দিতে হয়। ওষুধ তো দূরের কথা, পথ্যি পর্য্যন্ত না দিলে রক্ষে নেই। সাধ করে ব্যাটাদের ওপর চটে যাই? ভাত নেই, কাপড় নেই, ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, আশা নেই, ভরসা নেই, তবু বেঁচে থাকবার জন্যে ঝুলোঝুলি। পৃথিবীর জমি খানিকটা আগলে বসে থাকা ছাড়া পৃথিবীর কী কাজে লাগবে এই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগারা বলুন? নাভিশ্বাস উঠেছে তবু মরতে চায় না, এত মরণের ভয়। যমের অরুচি।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি কেটলীটা চাপিয়ে এসে চেয়ারে বসলেন। রুমাল নিয়ে হাতে—ষ্টোভ থেকে না-লাগা কল্পিত ভূষোটুকু ঘসে তুলতে তুলতে

বলেন—আপনার কথাবার্ত্তাগুলো সবসময় বুঝে ওঠা শক্ত। মনে হয় যেন ঠাট্টা করছেন, অথচ—

ঠাট্টা নয় ঠাট্টা নয়, জলজ্যান্ত সত্যি। কিন্তু থাকগে ওসব কথা, তার চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত সত্যের সন্ধান পাচ্ছি জঠরের মধ্যে। ঠিক না? আপনাদের মতে তো সার সত্য ক্ষুধা?

—আপাততঃ আপনারও একই মত হয়ে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে—এই নিন।—বলে বিস্কুটের টিনটা এগিয়ে দেন বলাকা দেবী।

দু' পেয়ালা চায়ের সঙ্গে প্রায় আধটিন বিস্কুট সাবাড় করে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে মিহির গুপ্ত গম্ভীর মুখে বলেন—এই জন্যেই বিভূতি বাবুর সঙ্গে আমার বনেনা। খিদে পেলে খাবোই আমি, এবং ভালো জিনিসই খাবো। আর সে ভদ্রলোকের মতে—'দেশের লোক না খেয়ে মরছে—সুখাদ্য খাবো কোন লজ্জায়?' আরে, বাবু—আমরাও যদি তাদের দেখাদেখি অখাদ্য খেয়ে মরতে সুরু করি লাভটা কার হ'ল? মড়াগুলো ভাগাড়ে টেনে ফেলবার জন্যেও তো দু' পাঁচটা সুস্থ লোকের দরকার? দুঃখীর সেবা করতে গিয়ে নিজেও যদি দুঃখী ব'নে বসে থাকি, আমার সেবা করতে কোন সাগরপারের লোক আসবে?

—তা ছাড়া—বলাকা দেবী বলেন—অপরকে বঞ্চিত করার মত নিজেকে বঞ্চিত করাও তো একটা পাপ? এই বিভূতিবাবুর কথাই ধরুন না—এত দিন ধরে এত যে কৃচ্ছ্রসাধন করলেন, শেষ রক্ষা হল কি? প্রকৃতি তার বাকী খাজনার শোধ নিলে।

দরকারের সময় কাজে লাগ্‌তে পারে এমন অনেক দামী দামী কথা মুখস্থ করে রাখেন বলাকা দেবী। অবিশ্যি লাগ্‌সই জায়গায় লাগিয়ে দেওয়াটা তাঁর নিজস্ব বাহাদুরী।

—বুড়ো বয়সে প্রেমে পড়ার জন্যে বলছেন?

—তাই তো বলছি, এটা কী বিশ্রী একটা স্ক্যাণ্ডাল হয়েছে বলুন দেখি? নিখিল নেই বলেই বলছি—দস্তুরমতো লোক হাসানো নয়? অথচ ওই বাবার সম্বন্ধে নিখিলের এত উচ্চ ধারণা ছিল—

—ছিল? এখন আর নেই নাকি?

ডাক্তারের স্বরে বিদ্রূপের আভাস।

—ঈশ্বর জানেন আছে কি না। আমার হ'লে থাকতো না।

—ঈশ্বরের দয়া যে আপনি নয়। কিন্তু ও প্রসঙ্গ থাক্, আপনি বরং কলকাতার গল্প করুন, অনেক দিন গাঁয়ে পড়ে আছি, শুনেও সুখ পাই।

এই এক আশ্চর্য্য স্বভাব মিহির ডাক্তারের।

এলায়িত ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন মানুষ, টেবিলের তলায় পা ঠুকছেন, টেবিলের উপর ঠুকছেন সিগারেটের টিন। অলস স্তিমিত দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস, হঠাৎ সোজা হয়ে বসেন—হাসির আভাস যায় মিলিয়ে, স্তিমিত দৃষ্টি মুহূর্ত্তে জ্বলে ওঠে।

মনে হয়—খুশীর খেয়ালে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে সহসা আত্মস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কারণটা বুঝে ওঠা শক্ত।

—কলকাতার আবার গল্প! গল্প করবার মত আর কিছু নেই কলকাতায়।

—শুনেও বাঁচলাম। আমাদের তো দস্তুরমত একটা ঈর্ষা আছে কলকাতার লোকের ওপর। স্বর্গের দেবতাদের ওপর মর্ত্তের জীবের যে রকম মনোভাব অনেকটা সেই গোছের আর কি।

খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠেন বলাকা দেবী।

কথার মোড়টা আবার সহজ পথ নিয়েছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে ওঠেন তখনকার মত। সত্যি লোকটার কী অদ্ভুত আকর্ষণ, কথা কইলে উঠতে ইচ্ছা করে না, তবু—মাঝে মাঝে যেন দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। ওর আসল মতটা বোঝা শক্ত বলেই সব সময় সব কথার উত্তর দেওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে।

—ওঃ আমাদের যে আর একটা মনোরম গল্প করবার ছিল—মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির গল্প?

—সেখানেও ওই একই উত্তর ডক্টর গুপ্ত, গল্প করবার কিছু নেই। পাথরের পুতুল দেখেছেন? ধ্যানী বুদ্ধ? ভাবের তারতম্য নেই—ধীর স্থির আত্মস্থ—কারুর কাছে কিছু চাইবার নেই, শুধু বিশ্বের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে বসে আছেন। আমার দয়াময় স্বামীটিকে কতকটা আন্দাজ করতে পারবেন।...

একটা ঘটনা শুনবেন শুধু? এই গত কয়েক দিনের কথা। আমার দাদার মেয়ের বিয়ে, চার বোনে গিয়েছি—দিন চারেক থেকে আসবার কথা। হঠাৎ দাদা বললেন—চল্, নতুন মেয়ে-জামাই নিয়ে সকলে মিলে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসা যাক্। কোথায়? কোথায়? কাছেই আছে পুরী। এক ঘণ্টায় ঠিকঠাক, এদিকে নিজেদের বাড়ীতে কারুরই খবর দেওয়া হয় নি। বললাম—সে কি দাদা, লোকগুলো ভাববে যে? দাদা বললেন—'ভাবুক না, বেশ একটু অ্যাডভেন্‌চার হবে, আর কার কতটা টান বোঝা যাবে।'

বললে বিশ্বাস করবেন না—পরদিনই আমার দুই ভগ্নীপতি পুরী গিয়ে হাজির, বলে কি না—আমাদের বাদ দিয়ে মজা করবে সেটি হচ্ছে না। বড়দির স্বামীর কাণ্ড আবার আলাদা, পুরো এক পাতা টেলিগ্রাম—হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে। আর আমার ঘরের

ধ্যানী বুদ্ধটী নির্ব্বাক পুতুল। এসে বললাম—'তিন দিনের জায়গায় তের দিন পরে এলাম—কারণ জানতে চাইলে না'? বললেন—'জিগ্যেস আর কি করবো—যুক্তিসঙ্গত কারণ একটা আছেই নিশ্চয়।' শুনুন কথা! বললাম—'খবর পাওনি ভাবনাও তো হয়?' স্বচ্ছন্দে বললেন—'বুঝতেই তো পেরেছিলাম খবর দেওয়া দরকার মনে করনি তাই দাওনি, খবর দেবার অবস্থা যদি না থাকতো অপরে দিত।'

—বাঃ চমৎকার লোক তো?

—চমৎকার?

—নিশ্চয়—দেখা করে আসতে ইচ্ছে করছে, নমস্য ব্যক্তি।

সত্যিই দুই হাত জোড় করে কপালের কাছ বরাবর এনেই ডাক্তার চমকে ওঠেন—কে রে ওখানে উঁকি মারছিস'?

—ডাক্তারবাবু আমি অমূল্য।

—অমূল্য? আবার এসেছিস মরতে? যা বেরো—যাব না। তোদের জন্যে আমি ব্যাটা মরবো নাকি? আব্দার মন্দ নয়! এই মাত্তর আমলাগোড়া থেকে আসছি বুঝলি? হরিহরের ভাইপো যায় যায়।

—কিন্তু বৌটা যে—

—'বৌটা যে'—বুঝলাম। কিন্তু তোর বৌটার জন্যে আমার কি মাথাব্যথা রে—যে এই সন্ধ্যের মুখে সাত মাইল রাস্তা ভাঙবো? কপালে আর দেখছি অন্ন নেই আজকে, ভাগ্যিস বিস্কুটগুলো ঢুকিয়ে রেখেছি পেটের মধ্যে—

ডাক্তার উঠে দাঁড়ান।

—ও কি আপনি সত্যিই যাচ্ছেন না কি?

—না গেলে ছাড়বে?

ওষুধের বাক্সটা সাইকেলের হাতায় ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে নেন মিহির ডাক্তার।

—নমস্কার মিসেস চ্যাটার্জ্জি। আবার দেখা হবে—ও না আপনি তো কাল চলে যাচ্ছেন? আচ্ছা বিদায়।……এই অমূল্য, উঠে পড না পিছনে।

—মাপ করবেন দেবতা।

—মাপ করবো কি রে হতভাগা? সাইকেলের সঙ্গে ছুটে হোঁচট খেয়ে মরে আরো কাজ বাড়া আমার? বিনি পয়সার ওষুধ-বড়ি—কেন রোগ করবি না? খুব করবি যত পারবি—কি বলিস?

ঝড়ের বেগে ডাক্তারের সাইকেল লাল সুরকির রাস্তা পার হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তায় গিয়ে পড়ে। ঋজু দীর্ঘ দেহের সতেজ ভঙ্গি চোখে পড়বার উপায় নেই,……অমূল্যর ছেঁড়া ফতুয়া পরা পিঠটা যেন হতচকিত মিসেস চ্যাটার্জ্জিকে তীব্র ব্যঙ্গ করে চলে যায়।

গ্রাম থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা আঁকা বাঁকা লাইন ধরে বরাবর ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে তারই একটা বড় বাঁকের ধারে লাহিড়ীদের কাছারী বাড়ী।

দোতলা বাড়ী এ অঞ্চলে আর নেই, অবাধ উন্মুক্ত পট ভূমিকায় ছবির মত সুন্দর একক বাড়ীখানা যেন সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—বনেদী জমিদার বংশের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়ে দিতে।

দেউড়ীর দু'ধারে কেশর ফোলানো সিংহের মূর্ত্তি বসানো মাঝারি দুটি থাম—স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ হিসাবে না হো'ক, সাধারণের থেকে বৈশিষ্ট্য রক্ষা হিসাবে মৌন গাম্ভীর্য্যে দাঁড়িয়ে আছে।

তারই গা ঘেঁসে প্রকাণ্ড দুটি ইউক্যালিপটাস গাছ।

নিখিলের পিতামহ ভূপতি লাহিড়ীর রোপিত চারা আজ পত্রবহুল বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সবটা মিলিয়ে ভূপতি লাহিড়ীর রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

নিজস্ব বিশাল জমিদারীর মধ্যে নিকটবর্ত্তী এই মনোরম স্থানটুকু বেছে নিয়ে ভূপতি লাহিড়ী অনেক যত্নে আর অনেক অর্থ ব্যয়ে এই বাড়ীখানি করেছিলেন অবসর যাপনের আশ্রয়স্থল হিসাবে।

সময়ের স্রোতে সৌন্দর্য্যপিপাসু ভূপতি লাহিড়ীর "কানন কুঞ্জ" আজ "শালবনী কাছারী বাড়ী"তে পরিণত হয়েছে। নীচের তলায় চলে কাছারীর কাজকর্ম্ম, আসবাবপত্রে সাজানো উপর তলা থাকে তালা বন্ধ।

শ্রীপতি লাহিড়ী—নিখিলের ছোট ঠাকুর্দ্দা—কালে কস্মিনে তদারক তল্লাস করতে আসেন—নীচের তলায় বড় হল্ খানাতেই থেকে যান,

দু' চার দিনের জন্যে আর তালা খোলার বা সিঁড়ি ওঠানামার কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হন না।

দীর্ঘ দিন পরে বিভূতিবাবু এই তালা খুলেছেন।

বিকেল বেলা পশ্চিমের জানলার সামনে নীচু বেতের মোড়া পেতে কল্যাণী মাথা হেঁট করে বসে একটা ছোট ফ্রকে এমব্রয়ডারী করছিল। নেহাৎ সাদাসিধে মোটা লংক্লথের ফ্রক, এতে সূচি-শিল্পের প্রয়োজন থাকবার কথা নয়, মনে হয় নিতান্তই যেন অবসর যাপনের উদ্দেশ্য।

তেইশ চব্বিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে, পাতলা নিটোল গড়ণ, মুখশ্রী অনবদ্য না হলেও চিবুকের ডৌলটি চমৎকার। আর চমৎকার আশ্চর্য্য সুন্দর চোখ দুটি। দীর্ঘ পল্লব ছায়াচ্ছন্ন কাঁচের মত স্বচ্ছ দুটি চোখ যখন নীচের দিকে দৃষ্টি মেলে থাকে মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। বোঝা যায় না পাতার ওঠা পড়া।

কিন্তু নিমেষের জন্য যদি মুখ তুলে তাকালো তোমার চোখে চোখ রেখে, অবাক হয়ে যাবে। শুধুই ডাগর? শুধুই কালো? শুধুই গভীর? না, তার উপরেও যা আছে সেটা হচ্ছে নির্ম্মল প্রশান্তি, যা এ বয়সের মেয়ের খুব কমই থাকে।

সেই প্রশান্ত দুটি চোখের নির্ম্মল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে সৌখিন কাজটুকু করছিল কল্যাণী, সেটা শেষ হ'তে অল্পই বাকী ছিল, বিকেলের আলো ম্লান হবার আগেই সেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে হাতের ছুঁচ চলছিল তাড়াতাড়ি।

—অত মন দিয়ে কি কাজ হচ্ছে?

চম্‌কে হাত কেঁপে গিয়ে চারুশিল্পের সরু যন্ত্রটি আঙুলের আগায় খোঁচা দিয়ে বসলো।

'উঃ'টা অস্ফুট হলেও ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হল না বিভূতিবাবুর।

সস্নেহে কাছে এগিয়ে এসে বললেন—ফোটালে তো ছুঁচটা ?···কী আশ্চর্য্য, অত চমকে ওঠ কেন ?

সেই ডাগর দুটি চোখ মেলে অল্প হেসে উঠে দাঁড়ালো কল্যাণী।

—থাক থাক, উঠছো কেন ? এই তো এতে বসছি আমি।

আর একটা বেতের মোড়া সংগ্রহ করে বসে পড়েন বিভূতিবাবু। কল্যাণী অসমাপ্ত কাজে ছুঁচটা বিঁধে রেখে জামাটা তুলে ফেলছিল—বিভূতিবাবু একটু আশ্চয্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—কার জামা হচ্ছে ?

—আশ্রমের।

—আশ্রমের ? সেখানের কাজ এখন পাচ্ছো কোথায় ?

কল্যাণী মৃদুস্বরে উত্তর করে—কতকগুলো কাজ হাতে নেওয়া ছিল, এখানে এসে তৈরি হয়ে গেছে, পাঠাবার সুবিধা পাচ্ছি না তাই বসে বসে ফুল তুলছি।

বিভূতিবাবু হাত বাড়িয়ে ফ্রকটা তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে আস্তে নামিয়ে রেখে বলেন—গরীবের ছেলেমেয়ের পোষাকে এত বাহারের দরকার কি কল্যাণী ?

—এমনি সময় কাটছিল না···কিন্তু ক্ষতি কি ?

—ক্ষতি ? একেবারে নেই তাও বলা চলে না। সৌখিন জিনিস বাহারে জিনিস একবার ব্যবহার করতে শিখলে আর সাদাসিধের মন উঠবে না তাদের, বরাবর তো এমন সুন্দর জিনিস জোগানো যাবে না !

—এক আধবার ভালো জিনিস ব্যবহার করবার ইচ্ছে হওয়াও তো স্বাভাবিক। পেলে কত খুসী হবে—খাটলেই যদি—

—খাটুনীর কথা নয় অন্য কথা, কিন্তু কত দ্রুত হাত চলে তোমার তাই আশ্চর্য্য হয়ে—

—দেখছিলেন ?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম কিনা।

মুহূর্ত্তে কল্যাণীর শ্যামলমুখ রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা হয়ে ওঠে, ঘুমিয়ে পড়ার মত ভারী চোখের পাতা দুটি নেমে পড়ে।

—তাই দেখছিলাম—এ-তো তুমি ইচ্ছে করলে ঘণ্টায় একটা করে ফেলতে পারো—তার জন্যে নয়, শুধু বলছিলাম—লোভের কথা। দয়ার ছলে আমরা যেন ওদের মধ্যে লোভের সৃষ্টি না করি।

—আচ্ছা আর করবো না।

—না-না, দুঃখিত হয়ো না। আমার আইডিয়াটা বুঝতে পারছো তো?

—পারছি।

মনে মনে বলে—বুঝতে পারছি না আবার, শুধু গরীবের ছেলেমেয়েদের বলে তো নয়, সকলের জন্যেই তোমার ঐ একই ব্যবস্থা। অপরকে লোভের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তোমার দানের হাত রেখেছো গুটিয়ে।

হঠাৎ মুখ তুলে বলে—কিন্তু তা'তে বঞ্চিত হবে কে? তা'রা, না আমি নিজে?

—তুমি?

—হ্যাঁ আমিই তো। দিতে না পারার ক্ষোভটা কি কিছু নয়?

চকিতের জন্যে একবার চোখে চোখ তুলে ধরে আবার নামিয়ে নেয়।

বিভূতিবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, উঠে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মৃদুগলায় বললেন—ঠিক বলেছ কল্যাণী, দিতে না পারার ক্ষোভও কম নয়। কিন্তু জোগাবার শক্তি যদি নিঃশেষ হয়ে যায়? যদি বরাবর দেবার ক্ষমতা না থাকে?

—তবে না দেওয়াই ভালো।

বলে মুখ টিপে একটু বাঁকা হাসি গোপন করবার চেষ্টা করলে কল্যাণী।

কিন্তু গোপন হ'ল না।

অপরাহ্নের শেষ উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। বিভূতি বাবু চমকে উঠলেন—আশ্চর্য্য! এ হাসি কল্যাণী কোথায় পেলে? শান্ত নম্র, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত যে মেয়েকে এতদিন দেখে এসেছেন বিভূতি বাবু, তার সঙ্গে তো এর মিল নেই। বিদ্রূপে বাঁকানো ঠোঁটের ছোট্ট একটু হাসি যে অনেক কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ করে ফেলে।

কল্যাণীর শান্ত সমাহিত স্বভাবের অন্তরালে কি লুকোনো ছিল বয়সের চাপল্য? না কৃতজ্ঞতার জায়গায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে অসন্তোষ?

কিন্তু অপূর্ব্ব এই হাসিটুকু! আবার দেখতে ইচ্ছা হয়।

কাটলো কিছুক্ষণ। কল্যাণী নাড়াচাড়া করছে ওর সেলাইয়ের টুকি-টাকি, বিভূতিবাবু জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন আকাশে—যেখানে সন্ধ্যামেঘের সমারোহ শেষ হয়ে নামছে রাত্রির ছায়া।

তাঁর জীবনেও কি এমনি অন্ধকার নেমে আসছে—সমস্ত বর্ণ সমারোহের সমাপ্তি ঘটিয়ে? রাত্রির হাতে করতে হবে আত্মসমর্পণ?

কিন্তু অন্ধকার কি আসেই নি?

যখনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন নির্ব্বাসন দণ্ড, ত্যাগ করেছেন "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমে"র সম্পর্ক, তখনি তো অবসান হয়েছে সমস্ত আলো, সমস্ত ঔজ্জ্বল্যের। "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমে"র "দেবতা"র ভূতকে দেখে হেসে উঠবে না তো মৃণ্ময়ী, নক্ষত্রের পাশে বসে?

আর "দেবতা"র ভক্তরা? ডাক্তার? শৈলমাসী? নিখিল?

হঠাৎ যেন সমস্ত স্নায়ুশিরায় টান ধরে। কঠিন পৌরুষের দৃপ্তভঙ্গী ফুটে ওঠে দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে, অনতিপূর্ব্বের ক্ষীণ দুর্ব্বলতা কোথায় মিলিয়ে যায় কে জানে?

দুর্ব্বলতার ইতিহাস কল্যাণীর জানা নেই।

তাই সহসা গম্ভীর হয়ে প্রায় কর্ম্মচারীকে কর্ম্মনির্দ্দেশের স্বরে বলেন—হ্যাঁ বলছিলাম কি, জানো বোধ হয় বাঁকুড়ার ওদিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, কয়েকটি ছেলেকে রিলিফের কাজে পাঠাচ্ছি। তারা আজ রাত্রে এখানে জমা হয়ে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে থেকে, কাল ভোরে সামান্য কিছু জল খেয়ে রওনা দেবে। আন্দাজ জন পনেরো ছেলে, বিছানা আর খাবার ঠিক করে রাখতে হবে।

নির্দ্দেশ দিয়ে থামলেন বিভূতি লাহিড়ী—থামলেনও না, পায়চারী করতে লাগলেন।

বাজনার তারে যে ঝঙ্কার উঠেছিলো, সে ঝঙ্কার যেন ঝনাৎ করে থেমে গেলো!

চিরসহিষ্ণু মন সহসা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ওঠে—ওঃ তাই! তাই এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। অকারণে সামান্য একটু ক্ষণ অবসর বিনোদনের জন্য স্ত্রী-সম্ভাষণে আসেননি বিভূতি লাহিড়ী, প্রয়োজনের খাতিরেই এসেছেন!

স্ত্রী?

হ্যাঁ আইনতঃ পরিচ   তাই বটে! কিন্তু এর বাড়া প্রহসনই বা আর কি আছে?

বাড়ীতে দাসদাসীর সংখ্যা কম নয়, এমন কি পুরনো যে বামুনঠাকুর নিখিলের জন্মানোর আগে কাজ করে গেছে, তাকে খোঁজ করে নিয়ে এসে রাখা হয়েছে—শুধু রান্না বলে না হোক, সংসারের ম্যানেজারী করতে। তারা সকলেই সসম্ভ্রম ব্যবহার করে, 'ছোট মা' বলে উল্লেখ করে, তবু সব কিছুকেই প্রহসন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না কল্যাণীর। থিয়েটারের সাজা রাণীকেও তো সকলে 'রাণীমা' বলে!

কল্যাণী যেন এ বাড়ীর এক সম্মানিত অতিথি, দোতলার ঘরে

আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা'কে, সকলের চেষ্টা তার সেবা-যত্নর ত্রুটি না হয়!

এ অবস্থা কি সহ্যের যোগ্য?

অসহ্য অবস্থাকে সহ্য করে নেবে এমন মনের ধৈর্য্য আর বুঝি নেই কল্যাণীর? তাই মুখ তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে বলে—এ আদেশ আপনি নীচের তলায় রান্নাঘরে দিয়ে যাবেন!

বিভূতিবাবু যেন একটু চমকে যান, একটু আহত হন, তারপর গম্ভীর প্রশান্তে বলেন—কেন, ওদের বলবো কেন? তোমাকেই তো বলা উচিত।

উচিত!

পা থেকে মাথা অবধি একটা অপমান বোধের বিদ্যুত শিহরণ খেলে যায় কল্যাণীর! একটা তীক্ষ্ণ স্বর বেরিয়ে আসে—হতে পারে; কিন্তু উচিত মতো কর্ত্তব্য করবার ক্ষমতা তো সকলের থাকেনা?

—ক্ষমতা? এতে আর ক্ষমতার কি আছে? ওদের ডেকে একবার হুকুম দেওয়া বৈ তো নয়!

তেমনি ভাবেই বলে ফেলে কল্যাণী—হুকুম পালন করাই যাদের অভ্যাস তাদের পক্ষে হুকুম করাটা সহজ নয়। হুকুম করাতে ক্ষমতার দরকার হয় বৈকি!

বিভূতি লাহিড়ী পায়চারী করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কল্যাণীর একটু কাছে সরে এসে বললেন—ক্ষমতা তো অর্জ্জন করে নেবার জিনিস, তাই নয় কি?

কল্যাণী কি একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলো, শ্রান্ত ভাবে বললো—আপনার সঙ্গে তর্ক করি এ শক্তি নেই, শুধু বলছিলাম—এ সংসারের কিছুই জানিনা আমি। আমাকে যদি কিছু নির্দ্দেশ দেন সেইটুকুই সাধ্যমতো করবার চেষ্টা করবো।

বিভূতি লাহিড়ী সহসা ক্রুদ্ধ ভাবে বলে ওঠেন—সবসময় অপরের নির্দ্দেশে চলবে কেন? তোমার নিজের বুদ্ধি রয়েছে, বিবেচনা রয়েছে—

—বিবেচনা?

সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা দেয় ওষ্ঠপ্রান্তে। তাই বটে, আগাগোড়া মস্ত এক বিবেচনার কাজই করে এসেছে বটে কল্যাণী! বিভূতি ভূষণকে ভালোবাসা—সেই বিবেচনা শক্তিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিদ্রূপহাস্যের আভাসটুকু পেলেন বিভূতি লাহিড়ী, কিন্তু এ হাসির পটভূমিকায় মুখের চেহারাটা কেমন হয়েছে তাই দেখার জন্যে আরো কাছে সরে আসেন।

দেখবেন এ মুখে রাগ আছে কি ক্ষোভ আছে, না শুধুই বিদ্রূপ?

কিন্তু না, মুখের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। গোধূলির সোনালি আলোটুকু একবার ঝলসে উঠেই গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে। ঘরের ভিতরে আর কিছু ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

কেন কে জানে, একটা তীব্র আক্রোশের ভাব ফুটে ওঠে বিভূতি লাহিড়ীর মনে। মনে হয়, একবার ওই পেলব সুকুমার দীর্ঘ দেহখানিকে দুহাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন—তোমারই বা এতো অহঙ্কার কেন?… কেন তুমি মহিমময়ীর মতো উঁচুতে দাঁড়িয়ে জীবনকে এমন অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবে?…কেন সাধারণ মেয়ের মতো তোমার মধ্যে একটু লোভ, একটু বাসনা, একটু সমর্পণের ভঙ্গী থাকবে না? তুমিই চলে এসো না কেন দৃঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে? ভাসিয়ে নিয়ে যাও সমস্ত দ্বিধা! এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার অবসান হোক!…

ভুলে যান—কল্যাণীর মধ্যে কোথাও যেন একটু অসাধারণত্ব ছিলো বলেই বিভূতি লাহিড়ীর আসন টলেছিলো।

অব্যবস্থিতচিত্ত বিভূতি লাহিড়ী যে আজ একটা পথ হাতড়ে

বেড়াচ্ছেন, একথা হয়তো কল্যাণী বুঝতে পারে না, কিন্তু বুঝতে পেরে সত্যই যদি সে নিজেকে নামিয়ে আনতো, যদি তার মধ্যে জীবনের প্রতি লোভের চেহারা উঁকি মারতো, তা'হলেই কি তাকে শ্রদ্ধা করতে পারতেন বিভূতি লাহিড়ী ?

কথা কইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কি কথা কইবেন ? কোথাও যে সহজের সুর বাজেনা।

এক মিনিট চুপকরে থেকে বললেন—আচ্ছা থাক, ওদেরই বলে যাচ্ছি।

নীচের তলায় নেমে এসে পুরণো ঠাকুরকে সব নির্দেশ দিয়ে বললেন —আর দেখো রামগতি, ওদের সঙ্গে আমিও বোধহয় বেরুবো কাল ভোরে, সরকার মশা'ইকে জানাবার সময় হলোনা, বলে দিও।

রামগতি চোখ কপালে তুলে বলে—আপনি যাবেন ওই ছোঁড়াদের সঙ্গে কোথায় না কোথায় ? না না, ও ইচ্ছে রাখুন।

—কেন রে ? ক্ষতি কি ?

—ক্ষেতি নেই ? বলেন কি বাবু? রিলিফের কাজ আমি জানি, ওতে কখনো শরীর টেঁকে ? মারা পড়বেন একেবারে!

—অতোগুলো লোক যাচ্ছে, তাদেরও তো রক্ত-মাংসের শরীর রে!

—তা হোক, সবাইয়ের রক্ত-মাংস কি আর সমান বাবু? সিংহীতে আর খরগোসে সমান হয় ?

—আচ্ছা দেখি—বলে চলে যান বিভূতি লাহিড়ী।

আর চলে যেতেই রামগতি আপন মনে বলে—বিয়েই করেছেন, পরিবারের সঙ্গে তো বনিবনাও নেই, এ বিয়ে করাই যে কেন ভগবান জানে!

ভোরবেলা বিভূতি লাহিড়ীকেও যাত্রার জন্যে প্রস্তুত দেখে কল্যা' অবাক হয়ে গেলো।···এ কি? নিজেকে নিজে শাস্তি দেওয়া? না কল্যাণীকে দুদিন এড়াবার একটা ছুঁতো?

অনেকবার ভাবলে, নিঃশব্দে থাকবে, বলবে না কিছু। কিন্তু পারলো না। নারীমন অত কঠিন হলেও, কোনো সময়ই কারো বিদায় কালে কঠিন হয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া—আজ বিভূতিবাবুর জন্মদিন।

আশ্রমে শৈলমাসী এ দিনটিকে আশ্রমের উৎসবে পরিণত করে রেখে-ছিলেন। কল্যাণীও মনে মনে অনেক কল্পনা করে রেখেছে। কতোটুকু সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে, আর কতোটুকু প্রকাশ করবে, এ নিয়ে ক'দিন ধরে আর চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু এমনি করেই কি কল্যাণীর জীবনের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে?

ঠিক বেরোবার মুখেই নীচে নেমে এলো, বললো—আজকের দিনটা না বেরোলেই নয়? কাল গেলে চলে না?

বিভূতি হয়তো এরকম প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, হয়তো বা ছিলেন না। বললেন—আজকের সঙ্গে তফাৎটা কি?

—আজ আপনার জন্মদিন।

—জন্মদিন!

হঠাৎ হেসে উঠলেন বিভূতি লাহিড়ী। বললেন সেটা ঘটা করে মনে পড়াবার প্রয়োজন এখনো আর আছে নাকি?

—সে প্রয়োজনও মিথ্যে হয়ে গেছে আপনার কাছে?

—কারুর কাছেই কি সে প্রয়োজন আছে?

আর কোনো উত্তর দেয় না কল্যাণী, উত্তর দেবার অবস্থাই কি আছে? ধীরে ধীরে একটা প্রণাম করে চলে যায়।

কিন্তু বিভূতিবাবু কি সত্যিই যেতে চেয়েছিলেন? মনের মধ্যে আর কোনো প্রত্যাশা ছিলোনা কি? যাই থাক, চলেই যেতে হয় শেষ অবধি।

—দিদি শুনছিস ?…এই দিদি ! কালা নাকি ? এই দিদি, ভাল চাস্ তো শোন্…বেশ বয়ে গেল, যা দিতে এসেছিলাম নিয়ে চললাম।

'নিয়ে চললাম' শুনে বোধ করি দিদির অটল গাম্ভীর্য্যের কোণ খসে, তবু মুখে অবহেলার ভাব বজায় না রাখলে মান থাকে কোথায় ?—কী এনেছিস হাতি ঘোড়া ? তাই সব কাজ ফেলে দেখতে যেতে হবে ? দেখছিস এখন অঙ্ক কষছি, বিরক্ত করতে এলো।

—বেশ বিরক্ত করবনা, পরে কিন্তু কিছু বলতে পাবি না দিদি ?

—বলব না—যা পালা বক্‌বক্ করিস না 'মলু'।

—ইঃ ভারী তেজ ! এদিকে তো ছট্‌ফট্ করে মরছিলেন—

গাম্ভীর্য্যের চূড়া খসে পড়ে।—'ডেভিড কপারফীল্ডটা' খুঁজে পেয়েছিস বুঝি ? দে না ভাই। পর্শু থেকে খুঁজছি—

—ইঃ এখন দে না ভাই। আর তখন গ্রাহ্যই হচ্ছিল না ? বই না কচু, এই দেখ্—চললাম মাকে দিতে।

একটি সুদৃশ্য নীল খামের চিঠি তুলে ধরেই ছুটে পালিয়ে যায় মল্লিনাথ।

সর্ব্বনাশ !

নিশ্চয়ই নিখিলের ! এখন উপায় ? অঙ্ককষা শিকেয় তুলে রেখে, শ্রীমান মল্লিনাথের খোসামোদ করতে ছুটতে হয়।—

—এই 'মলু', দে ভাই দে, লক্ষীটি মাকে দিস না, তোর পায়ে পড়ি ভাই, দিবিনা ? বেশ দিসনি, অথচ সেই নীল খাতাখানা তোকে দেবার জন্যে তুলে রেখেছি আমি।

—তাই বই কি, 'দেবার জন্যে তুলে রেখেছেন' আরো কিছু না? সেদিন কত চাইলাম, দিলি?

—সে তো মজা করবার জন্যে। নইলে তোকে আর একটা সামান্য খাতা দিতে পারি না?

—এই নে, যাঃ। দিবি তো খাতা?

—ঠিক দেব ভাই, লক্ষ্মী ছেলে! মাকে বলিসনি কিন্তু চিঠির কথা।

—আমি অত বোকা নই মশাই, মাকে বললেই এখন তোর ফাঁসি, আর আমার জেল।

নিখিলের সেই ছোট্ট চিঠি।

ভবানীপুরের এই সাদা রঙের ছোটখাটো বাড়ীখানিতেই তা'র ঘন ঘন 'জরুরী কাজ' পড়ে।

বাড়ীর কর্ত্তা উকিল হ'লেও লোক ভালো।

গৃহিণীকেও মন্দ লোক বলবার হেতু নেই, তবে ছেলেমেয়ের উপর শাসন কিছু কড়া। মেয়ে মণি ওরফে 'তর্কচূড়ামণি' ম্যাট্রিক পড়ে, ছেলে 'মল্লিনাথ' এইবার ক্লাশ 'নাইনে' উঠেছে। ছেলেবেলা থেকে দুটি ছেলেমেয়ের কথার বহরে তরুবালা এই নাম বাহাল করেছেন।

অবশ্য তরুবালা নিজেও কম যান না, তাঁর বাপ-মা তেমন রসিক হলে বোধ করি 'বাক্যবারিধি' নাম দিতেন।

নিখিলকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নিজেরা দুজনেই যথেষ্ট ভালোবাসেন, মল্লিনাথের ভালোবাসাতেও তাঁদের আপত্তি দেখা যায় না, শুধু মেয়ের সম্বন্ধেই ঘোরতর আপত্তি।

বড়লোকের ছেলে, চেহারা ভালো, লেখাপড়ায় চমৎকার, তার

উপর—সাদাসিধে স্বভাব, এতে কে ভাল না বেসে থাকতে পারে? তরুবালা নিজেই স্বীকার করেন। দু'চার দিন না এলে অনুযোগ করতেও ছাড়েন না, কিন্তু তাই বলে মণি?

সেখানে তরুবালার কড়া পাহারা।

হ্যাঁ, আশা করবার কিছু থাকতো, সে আলাদা কথা। বামন হয়ে তো আর চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন দেখতে পারেন না?

কিন্তু কথায় আছে সমুদ্রে বালির বাঁধ। তর্কচূড়ামণিরও হঠাৎ উমা নামক এক প্রিয় বান্ধবীর বাড়ী ঘন ঘন জরুরী কাজ পড়ে যায়, দু'জনে একসঙ্গে না পড়লে পরীক্ষার পড়া তৈরী হয় না এমনি নাকি নিদারুণ পড়া ম্যাট্রিক ক্লাশের!

আর অখ্যাত উকিলের টেবিলে টেলিফোন রিসিভার না থাকলে চলে বলে তো আর পশারওয়ালা ডাক্তারের চলে না? ডাক্তারের অনুপস্থিতির সুযোগে সুযোগের অপব্যবহার করে না তর্কচূড়ামণি।

ছোট্ট চিঠি, কয়েকটি লাইনের সমষ্টিমাত্র—এত ভালো লাগে কেন?

কে দিতে পারে এই কেনর উত্তর? প্রেম যখন প্রথম পল্লবিত হয়ে ওঠে কৈশোর যৌবনের অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে, কেন ভালো লাগে সমস্ত পৃথিবী? কেন ভালো লাগে আকাশ বাতাস দিনরাত্রি, নিত্যদিনের দেখা অতি পরিচিত পটভূমি?

কেন এত ভালো লাগে নিজেকে নিজের?

যে মেয়ে—কৈশোরের সোনার দিনে একবার প্রেমে পড়ল না, সে ফুটল কই? প্রখর দিনের আলোয় যার ঘুম ভাঙে, সে বুঝবে কি করে ভোরের আলোয় কী যাদু?

অধিকাংশ মায়েরাই ছেলেমেয়েদের সাপ বাঘ আর ভূত প্রেতদের কাছ থেকে সাম্‌লে বেড়ানোর চাইতেও বেশী দুর্দ্দান্তভাবে সামলে

বেড়ান প্রেমের কাছ থেকে। ও যেন কুৎসিত ব্যাধি, ও যেন প্রচণ্ড পাপ।

কুড়ি বাইশ পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত যতদিন না তাঁরা মেয়ের জন্য একটি বৈধ প্রণয়ী সংগ্রহ করে উঠতে পারেন, ততদিন তা'রা—সেই নবযৌবনারা—সরল শিশুর মনোহর ভঙ্গীতে শুধু হেসে খেলে নেচে গান গেয়ে মা বাপের মনোরঞ্জন করুক এই তাঁরা চান।

আরো দরিদ্র মধ্যবিত্ততায় নেমে আসুন।

// যুবতী অনূঢ়া মেয়ে—সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তা'র মাথায়। সে রাঁধবে বাড়বে, বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, রোগীর সেবা, শিশুর পরিচর্য্যা, সব কিছু ঝঞ্ঝাটের ভার নিয়ে প্রৌঢ় মা-বাপকে অখণ্ড প্রেম-চর্চ্চার অবসর দেবে, আর বৎসরান্তে একবার করে 'আঁতুড় তোলা'র ঝক্কি পোহাবে। কারণ সে—"বুড়োধাড়ী মাগী, বয়সে বে' হলে সাত ছেলের মা হতো"—।

কিন্তু চোখ তুলে তাকাক দিকিন সে একবার পৃথিবীর আলো বাতাসের দিকে! তাকাক দিকিন নতুন আলো-লাগা চোখে পুরুষের মুগ্ধ চোখের দিকে! তাকাক আপনার নবজাগ্রত হৃদয়ের দিকে! ব্যস্ আর রক্ষা নেই! গেল সৃষ্টি রসাতলে!

তবু সৃষ্টি রসাতলে যাবার চেষ্টা করলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও রক্ষা করবার ক্ষমতা থাকে না।

তরুবালার কী সাধ্য কিশোরী মেয়ের মনের গতিকে আটক রাখতে?

ছোট্ট চিঠির উত্তরটা খুব যে ছোট হয় এমন নয়, কিন্তু পোষ্ট করতে হলেও আবার উমার বাড়ীই দরকার পড়াতে হয়। যতই হোক—মানে যত 'পাকা পক্কান্ন' ছেলেই হোক—মল্লিনাথ ছেলেমানুষ, তাকে বিশ্বাস করা কঠিন, যদিই বেফাঁস বলে বসে চিঠির কথা?

ও কি ভেবেছিল নিখিল ওকে চিঠি দেবে? কল্পনা করেছিল কোনোদিন—চৌকো নীল খামের মধ্যে একমুঠো স্বর্গ ভরে কেউ পাঠাবে তাকে? একান্তভাবে তাকেই?

সত্যি বলতে, বাড়ীতে কতটুকু অবসর সে পায় নিখিলের সঙ্গে কথা কইতে, চোখে চোখে চাইতে? বাৎসল্য স্নেহে ভরপুর তরুবালা নড়তে চাননা যতক্ষণ সে থাকে। হয়তো চুরি করে একবার চোখোচোখি, একটু হেসে ফেলা, নিতান্ত সাধারণ দু'চারটে কথা—এই পর্য্যন্ত।

ভাব যেটুকু এগিয়েছে তার জন্যে টেলিফোনের তারের কাছে করতে হয় ঋণ স্বীকার। অবিশ্যি প্রেমের কথা নয়, সাজানো গোছানো কথা নয়, নিতান্তই অর্থহীন এলোমেলো সে সব কথা, শুধু দুজনের কণ্ঠস্বর দু'জনের কাণে বাজে সেই সুখ।

সকালবেলা।

তরুবালা মোচার ঘণ্ট রান্না সম্বন্ধে বামুনঠাকুরের সঙ্গে বিশদ আলোচনা চালাচ্ছিলেন, পিছন থেকে 'মণি'র সপ্রতিভ কণ্ঠ বেজে উঠলো।

— উমাদের বাড়ী একবার যাচ্ছি মা, ভীষণ দরকার।

মুখ ফিরিয়ে তরুবালা বিরক্তকণ্ঠে বললেন—চব্বিশ ঘণ্টাই তোর উমার বাড়ী 'ভীষণ দরকার'! ইস্কুল নেই?

—ইস্কুল তো আছেই, একটা বই খুঁজে পাচ্ছিনা যে—জেনে নেব ওর কাছে—

—নিত্যি তোমার বই হারানো মা, ধন্যি বটে। মন মাথা কোথায় থাকে শুনি?

মনের অবস্থান সম্বন্ধে কিছুদিন থেকেই তরুবালার কিছু কিছু সন্দেহ

জেগেছে। যতই 'ইনোসেণ্ট' ভাব দেখাক মণি, তবু মার চোখ কি এড়াতে পারবে?

পরীক্ষার বইয়ের মধ্যে হঠাৎ কি এমন রস পেলো সে, যে ক্ষণে ক্ষণে এমন অকারণ খুসীতে চঞ্চল হয়ে ওঠে? কালো চোখে জ্বলে ওঠে আলোর বিদ্যুত? লাবণ্যে টলটল মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে অজানা আশঙ্কায় কেমন যেন ভয় ভয় করে তরুবালার।

তাই শাসনের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়াতে থাকে।

—গোবিন্দকে পাঠিয়ে দে না, কী বইয়ের দরকার নিয়ে আসুক।

—ও বাবা! গোবিন্দ! তবেই হয়েছে, কি বলতে যে কি বলবে—হয়তো একখানা টাইমটেবলই এনে বসে থাকবে।

কিন্তু তরুবালাও নাছোড়বান্দা, উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলেন—হ্যাঁ, ওই তোদের এক কথা, চিরকুট লিখে দে না একটু।

—সে ঠিক হবে না মা, সে সব অনেক জিনিস জেনে নেবার আছে, তুমি বুঝবে না—

—তা' বুঝবো কেন? তরুবালা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—পাশের পড়া পড়িনি বলে সাদাকথাও বুঝতে পারবো না? যখন তখন তোর ওদের বাড়ী যাবার কী দরকার শুনি? ও আসে? ওরা বড়লোক—

—বাঃ বড়লোকের মতন কিছু দেমাক আছে নাকি ওদের? কী রকম ভালো উমার মা—

—হ্যাঁ গো বাছা হ্যাঁ, সকলের মা-ই খুব ভালো, যত মন্দ তোমার মা। কি করবে বল, এরকম দজ্জাল মার পেটে জন্মে ফেলেছ যখন, উপায় কি?

—বা রে, তাই বুঝি বললাম? ভালোকে ভালো বললে কি হয়? এইযে তুমি বল 'সতীশবাবু বেশ লোক', তা'র মানে বুঝি বাবা ভয়ানক খারাপ।

রাগের মধ্যে হঠাৎ হেসে ফেলেন তরুবালা।

—দূর হ, পোড়ারমুখো মেয়ের কথা শোন! এই আজ যাচ্ছো যাও, কিন্তু নিত্যি নিত্যি ওরকম যাওয়া চলবে না তা' বলে দিচ্ছি। সাধে নাম রেখেছি "তর্কচূড়ামণি"!

উত্তর দেবার আগেই তর্কচূড়ামণি উধাও। পরের কথা পরে বোঝা যাবে, কিন্তু আজ একবার না যেতে পেলে তার জীবন মিথ্যে। ঠিক সময় উত্তর না পেলে বলবে কি নিখিল? বুড়ো হয়ে গিয়েও মা-বাবারা সব এত চালাক থাকে কি করে এই আশ্চর্য্য। চোখে ধূলো দেওয়া দায়।

উমাই যা তার ব্যথার ব্যথী, বুঝুক না-বুঝুক বলে দেয় না। তা ছাড়া ওর মার অত অনুসন্ধিৎসা নেই। একটা পশমের গোলা আর গোটা দুই লোহার কাঁটা হাতে পড়লেই পৃথিবীর দরজা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে। যেখানে যা নতুন প্যাটার্ণ দেখছেন তুলে আনছেন তার নমুনা, নিজেই আবিষ্কার করছেন নতুন প্যাটার্ণ, আর নিতান্ত অবশ্য কর্ত্তব্যগুলো সারা হলেই গোলা হাতে নেমে পড়ছেন যুদ্ধে। নয়তো ছুটছেন কমলা পিসির বাড়ী, যেখানে হাতের কাজ চালাতে চালাতে রসনাও চালানো চলে।

উমা যে বড় হয়েছে—উমাকে যে আগলে বেড়ানো দরকার, সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ—এত সুবিধা সত্বেও হাঁদা উমি, সময় পেলেই রান্না শিখতে ব্যস্ত।

সন্ধ্যা মেঘে যে রঙিন আলো পশ্চিমের আকাশে সোনার ছবি আঁকে তার দিকে একবার চেয়ে দেখবার ফুরসৎ নেই ওর, বামুন ঠাকুরের কাছে মাংসর কোর্ম্মা শিখতে বসেছে হয়তো।

মণি যদি উমার মার মেয়ে হ'ত!

সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কেমন ব্যথায় টন্‌টন্ করে আসে…বাবা? মন্নি? নাঃ তার চেয়ে তরুবালাই যদি উমার মার মত হ'তেন!

উমা খালি হাসে, বলে···এতও পারিস তুই চুড়ো ? বসে বসে ছ'পাতা ভর্ত্তি চিঠি লিখেছিস ? তোদের মোটা বাসন্তীদি স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন এ আবার জানাবার মত এমন কি কথা, তাই লিখেছিস ? দেখিস···পড়ে হাসবেন নিখিলবাবু।

—যাকগে যাক্, যেখানে হাসবেন হাসুন দেখতে পাবো না তো ? যা মনে এলো লিখে দিলাম।

লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে মণি। সত্যি—হাতের লেখা এত ভালো করে এত যত্নের সঙ্গে এবং এত রিস্‌ক্ নিয়ে যে পত্র রচনা, তা'র বিষয়বস্তুটা তেমন জোরালো হয়নি তো !

নিখিল এতদিন না আসায় মল্লিনাথ কি বলে সে কথা এত বিস্তারিত লেখবার কি ছিল ? মণি কি ভাবে, সে কথা জানানো হল কই ? কিন্তু কী সাধ্য মণির—যে সেই অগাধ সমুদ্রকে ভাষার বন্ধনে বন্দী করবে ?

কলম ধরার সঙ্গে সঙ্গেই যে সমস্ত হৃদয় পূর্ণিমার সমুদ্রের মত উদ্বেল হয়ে উঠেছে। হিমশীতল কম্পমান আঙ্গুলের ডগা কটি দিয়ে কলম ধরে সাদা কথা লেখাই অসম্ভব হয়ে ওঠে যে। কতবার ছিঁড়ে ফেলে, কতবার খসড়া করে তবে তো এই তুচ্ছ চিঠি। কিন্তু নিখিল কি তুচ্ছ করবে !

কিন্তু চিঠির মূল্য কি সবাই রাখে ?

প্রফেসর চ্যাটার্জ্জির টেবিলে মূল্যবান কাগজে লেখা যে চিঠিখানি চৌকো সাইজের পুরু দামী খামের মধ্যে আত্মগোপন করে গতকাল থেকে পড়ে আছে, তাকে খুলে পড়বার পর্য্যন্ত সময় হয়নি প্রফেসরের। চিঠি জিনিসটা কী এতই তুচ্ছ ?

টেবিল গোছাতে এসে নির্ম্মলা দেখে—বাইশ ঘণ্টা ধরে একই অবস্থায় পড়ে আছে চিঠিখানা, দেখে অবাক হয়ে গেল।

বিধবা মেয়ে—মামার আশ্রয়ে থাকে, সংসারের যা কিছু দায়িত্ব আর মাথা পাগলা মামাটির ভার তার উপর।

মামীর আচার-আচরণে খুব সন্তুষ্ট তা নয়, কিন্তু প্রতিবাদ করবার স্বভাবও তার নয়। তবু চিঠিখানা দেখে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল, ভাবলে—সত্যি বাবু, মামী রাগ করে আর না করে! চিঠিখানা এসে পড়ে আছে কাল থেকে—পড়বার ফুরসৎ হয়নি ?

কাছে থাকতে তো অষ্টপ্রহর মামীর মেজাজের ঠ্যালায় অস্থির। রাগ, অভিমান, তর্ক, জেদ, হাঙ্গার-স্ট্রাইক, 'ফিট্' হয়ে পড়া—কত কি কাণ্ড, কিন্তু দূরে গিয়ে সেই মানুষ আছেন কেমন ? কোন ভাষায় জানিয়েছেন মনের কথা ? চিঠিতে খানিকটা ঝগড়া ভরে পাঠান নি তো ?

আপনার মনে হেসে ফেলে নির্ম্মলা।

আর মামাকে খুব একচোট নেবে বলে ঠিক করে রাখে।

ভাত খাবার সময় ছাড়া মামার পাত্তা পাওয়া শক্ত। তাই—খাওয়ার টেবিলের একপাশে চিঠিখানা বেশ দৃশ্যগোচর করে রেখে দিল। প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি চিরদিনই আসন পেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে

আহারের পক্ষপাতী, কিন্তু বলাকার সাধে আর সাধনায় বাড়ীতে টেবিলের প্রবর্ত্তন।

তবে শুধুই টেবিল চেয়ার, যন্ত্রপাতির চলনটা আর কিছুতেই করে উঠতে পারেন নি।

প্রফেসর থামখানার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে, চিরঅভ্যাসমত প্রথমেই জলের গ্লাসটা মুখে তুলে ধরলেন—আহারের গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে।

নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—এঁঠো হাত করে ফেলোনা মামা, চিঠিটা—

—পড়লেই হবে'খন ধীরে সুস্থে, খাই আগে।

নির্ম্মলা ব'কে ওঠে—তোমার ধীরে সুস্থে হ'তে ক'দিন লাগে মামা? কাল সকাল থেকে পড়ে আছে চিঠিটা, পড়বার সময় হয় না? মামী কি সাধে তোমার ওপর চটা?

—তা যা বলেছিস, তাড়াতাড়ি কিছু করা আমার দ্বারা হয় না।

—হবে না কেন? খুব হয়—কারুর যদি সর্দ্দিজ্বর হয়, তাড়াতাড়ি গিয়ে বিধান রায়কে ডেকে আনতে পারো তুমি।

—সর্দ্দিজ্বর কি সোজা জিনিস হ'লরে নির্ম্মলা? কী না হতে পারে ও থেকে? ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, থাইসিস—

—তোমার শাশুড়ীর মাথা!—নির্ম্মলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

শক্ত শক্ত রোগের নাম করলেই—কোন অজ্ঞাত কারণে বলা যায় না—নির্ম্মলা সাংঘাতিক চটে ওঠে, কাজেই তাকে ক্ষেপাবার এই এক অমোঘ অস্ত্র। ইচ্ছে হলেই প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি কোন না কোন ছলে সুরু করবেন—খাবার জলটা ভালো করে ঢাকা দিয়েছিস তো নির্ম্মলা? জানিস তো—জল থেকেই টাইফয়েড, ডিসেন্ট্রি, কলেরা—

নির্মলা দুইকাণে হাত চাপা দিয়ে বকতে থাকবে—ভালো হবে না বলছি মামা, চুপ করো শিগগির।

বলাকা দেবী এসব আদিখ্যেতা সহ্য করতে পারেন না, হাড় জলে যায় তাঁর। বিশেষত যখনি দেখেন অন্যের সঙ্গে কথা কইতে গেলে দিব্যি সহজ হাসির সুর ফোটে স্বামীর কণ্ঠে, আর তাঁর কাছে এলেই ভিন্নমূর্তি, তখনই ব্রহ্মাণ্ডে আগুণ ধরে যায়। আর নির্মলাই কি কচি খুকী? মামীর সঙ্গে প্রায় একই বয়সী যে!

অনেক সময়—মুখের সামনেই—"অসহ্য" "বিরক্তিকর" "ন্যাকামী" বলে ঠোঁট উল্টে উঠে চলে যান।

বলাকার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর কর্তা থেকে চাকর, বামুন, গয়লা, ধোবা সকলেই সহজ স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।···

নির্মলার মুখে "শাশুড়ীর মাথা" শুনে প্রফেসর হো হো করে হেসে ওঠেন—সে ভদ্রমহিলাকে আর স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনা কেন?

—তোমাকে শাসন করতে, আর কেন!

—আমাকে শাসন? সে তো তুইই রয়েছিস?

—উঁহু, ঠিক জব্দ হচ্ছনা তুমি আমার মত ভালমানুষ শাশুড়ীর শাসনে। জবরদস্ত লোক চাই।

—তার জন্যে তো শাশুড়ীর মেয়েটিই রয়েছেন—নেহাৎ কম নয় বোধ হয়।

দুষ্টুমির হাসি হাসতে থাকেন প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি।

আশ্চর্য্য! বলাকার অসাক্ষাতে তার মেজাজের ওজন নিয়ে হাস্য পরিহাসও করা চলে, কিন্তু চারিদিকের আবহাওয়া া গুমট করে তোলবার কী অদ্ভুত ক্ষমতাই না বলাকার আছে! নিঃশব্দে দুবেলা দুটি খেয়ে নিয়ে কেটে পড়তে পারলেই যেন বাঁচা যায়।

অথচ বাইরের লোকের কাছে বলাকা ? সে আর একজন।

রাত্রে বিছানায় শুতে এসে দেখলেন—বালিশের উপর চিঠিখানা রেখে গেছে নির্মলা। না পড়িয়ে ছাড়বে না !

অল্প হেসে খামের পাশটা ছিঁড়লেন।

বলাকার সেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ চিঠি।

খানিকটা পড়ে ভাঁজ করে রেখে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বেড স্থইচ অফ্ করার সঙ্গে সঙ্গেই নির্মল চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেল।

কিন্তু এমন সময়ও আসতে পারে যখন চাঁদের আলোও অরুচিকর।

চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে পড়ে থাকেন প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি।······

আচ্ছা, বলাকা কেন স্বাভাবিক হ'তে পারে না ? কেন পারেনা তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করতে ? পাদপ্রদীপের সামনে অভিনয় করেই সারাজীবনটা কাটলো তার ?

নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার আর কোনো পথই খুঁজে পেল না সে ?

এই গ্লানিকর অরুচিকর অভিনেত্রীর জীবনই তার কাম্য হ'ল ?

বন্যাপীড়িতদের জন্য যথাসাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়ে দিনদুই পরে ফিরলেন বিভূতি লাহিড়ী। খবর দিয়ে আসবার সময় ছিলনা, সঙ্গেও কাউকে আসতে দেননি। 'কাছারী বাড়ী'তে এসে পৌছলেন একা।

রোদে পৃথিবী ফাটছে, লাল হয়ে উঠেছে মুখ, দেখে কাছারীঘরে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলো সবাই—এ কি? এ রকম কেন?

ঈষৎ হেসে সকলকে মৃদু সম্ভাষণ জানিয়ে ঢুকে পড়লেন বাড়ীর মধ্যে।

রামগতি তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে দিবানিদ্রার মাদুর শয্যাটি হাতে নিয়ে বিছাবার জন্যে বাতাস-খোলা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনিবকে দেখে মাদুর দেয়ালে ঠেশিয়ে ছুটে এলো। বললো—বাবু এখন? এমন অসময়ে? বিনি খবরে?

এখানকার লোকের মধ্যে একমাত্র রামগতিই 'সে যুগের' সাক্ষী। ওর সঙ্গে ঠিক মনিব-চাকরের সম্বন্ধ নয়। যেন "আপনার লোকের" কোঠায় পড়ে। তাই কর্ত্তা সহাস্যমুখে বলে উঠলেন —কি হে, খবর কি? হাঁড়ি উঠিয়ে দিয়েছ বুঝি? তাই ভাবনায় পড়ে যাচ্ছো?

রামগতি ভাবনার কথায় অবজ্ঞা ভরে বলে—কি যে বলেন বাবু, হাঁড়ি উঠে গেছে বলে রামগতি গাঙ্গুলী ভাবনায় পড়ে যাবে! তা'ও কার জন্যে—হুঁঃ!

—তা' আশ্চর্য্যি কি—বিভূতি লাহিড়ী মৃদু হাসেন—জানো তো, দ্রৌপদীর ভোজন শেষ হয়ে গেলেই অন্নপাত্তর শূন্য হয়ে যায়, তখন স্বয়ং নারায়ণ এলেও তাঁর ভাত জোটেনা?

এতো কষ্ট করে এসে, কতো লোকের কতো কষ্ট দেখে এসেও বিভূতি লাহিড়ীর মনটা যে কেন আজ এমন হাল্‌কা হয়ে রয়েছে কে জানে! যৌবনের চাঞ্চল্যময় দিনে এমনি ঠাট্টাতামাসা করেই কথা কইতেন তিনি রামগতির সঙ্গে। নিখিলের মতোই আনন্দচঞ্চল স্বভাব ছিল তাঁর।

কিন্তু সে চাঞ্চল্যের রেশ কি আবার উঁকি দিলো স্বভাবের কিনারায় কিনারায়?

তিনি অবশ্য রাঁধুনী হিসাবে রামগতিকেই দ্রৌপদী আখ্যা দিলেন, কিন্তু রামগতি কি বোঝে কে জানে। সে উত্তর দিয়ে বসে—আজ্ঞে তা' যদি বলেন, তা'হলে অন্নপাত্তর শূন্য হবার কথা নয়, 'ছোট মা' তো আজ উপোসী।

ছোট মা!

তাই বটে! এই নতুন নামে একজন যেন অলক্ষ্যে কোথায় রয়েছে! কিন্তু আছে যে সে কথা কি মনে ছিল না বিভূতি লাহিড়ীর?

ছিলো বৈকি।

কারণে অকারণে অনবরতই তো তার নাম মনে পড়েছে, একটি বিষণ্ণ ব্যথিত ভাব নিয়ে মনের মধ্যে জেগেই ছিলো তার মুখ।

আশ্চর্য্য! অকারণে কেন অমন রূঢ় ব্যবহার করে গেলেন তার সঙ্গে! না কি যাওয়াটাই রূঢ়তার একটা ইচ্ছাকৃত প্রকাশ? সত্যিই কি তিনি নিজে যাবেন একথা আগে স্থির করেছিলেন?

নাঃ, করেন নি।

এ যেন কল্যাণীকে শাস্তি দেওয়া! কিন্তু শাস্তি সে পেয়েছে কি? না তার সহিষ্ণুতার কঠিন বর্ম্মে ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে এ অস্ত্র?

কতো সন্দেহ, কতো দ্বিধা!

তবু আশ্চর্য্য, হঠাৎ কাল মনটা বদলে গেলো। মনে হলো—সব

কিছুর প্রতিকার বুঝি তাঁর নিজেরই হাতে রয়েছে। মনটা হাল্‌কা করে চলে এলেন।

কিন্তু রামগতি একথাটা কি বললো ?

উপোসী কেন ? কোন ব্রতট্রত নাকি ? প্রশ্ন করতে লজ্জা করলো। একটু অলসমন্থর গতিতে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন।

রামগতি বোধহয় প্রশ্নের আশা করেছিলো, একটু অপেক্ষা করে বলে —আপনি গিয়েছেন অবধিই উপোস যাচ্ছে, এই তিন দিনই তো—শরীর খারাপ, জ্বরভাব !

—তাই নাকি—বলে ওপরে উঠে যান বিভূতি লাহিড়ী। ···শরীর খারাপ! কি হলো হঠাৎ ? কল্যাণীর শরীর খারাপ, মনেই তো পড়েনা একথা !

মনের লীলার অন্ত পাওয়া ভার।

রামগতি ভেবেছিলো—বাবু গৃহিণীর অসুখের কথা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবেন, তাই তাড়াতাড়ি খবর দিয়েছিলো। কিন্তু অদ্ভুত মজা, খবরটা শুনে যেন কেমন একটু ভালই লাগলো বিভূতির, যেন একটা ছুতো পাওয়া গেলো পত্নী সম্ভাষণের।

দরজায় ভারী পর্দ্দা ঝুলছে। বহুপূর্ব্বকালের ফ্যাসানের ভেলভেটের পর্দ্দা। রংটা খানিক খানিক জ্বলে গেছে, তবু দেখলেই বোঝা যায় এবাড়ীতে একদা কোন সময় সৌখিন কর্ত্তা বিরাজ করতেন।

পর্দ্দার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করলেন বিভূতি লাহিড়ী, গলাটা পরিষ্কার করে একবার মৃদুগভীর স্বরে ডাক্‌লেন—কল্যাণী! ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ভেলভেটের সেই ভারী পর্দ্দাটা সরিয়ে ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে।

রৌদ্রদগ্ধ নিস্তব্ধ দুপুর। জানালাগুলো বন্ধ।

ঢুকে পড়েই প্রথমটা চোখে কিছুই ঠাহর হলো না, দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কল্যাণী ঘুমোচ্ছে।

অসুস্থ শরীর বলেই হয়তো দিনের বেলা এমন করে ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারটা চোখে সয়ে গেলো, তাকিয়ে দেখলেন গভীর নিদ্রার স্তব্ধতা কল্যাণীর মুখের রেখায়।

কল্যাণী ঘুমোচ্ছে? এদৃশ্য কি এর আগে কোনদিন দেখেছেন বিভূতি লাহিড়ী। নাঃ দেখেননি। কিন্তু দেখো—ঘুমোলে কেমন অসহায় লাগে মানুষকে। কেমন যেন একটি আত্মসমর্পণের ভঙ্গী, দেখলে মায়া লাগে। একটা মাদকতার স্বাদ জাগে।

তা' এতো কুণ্ঠার কি আছে!

ওই শয্যার একপ্রান্তে গিয়ে বসতে পারেন না বিভূতি লাহিড়ী? কপালের ওপর একটু হাতের স্পর্শ দিয়ে দেখতে পারেন না স্পষ্ট জ্বর হয়েছে কি না? কেন এতো আড়ষ্টতা? কেন এতো বাধা?

সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে কাছে এগিয়ে গেলেন। বিছানার ধারে দাঁড়িয়েই কল্যাণীর কপালের ওপর ডান হাতখানা রাখলেন। বুঝতে পারলেন না জ্বর কিনা, কপালে ঘাম ফুটে রয়েছে।

হাত ঠেকার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ঘুম ভেঙে চমকে উঠলো কল্যাণী, চমকে অস্ফুট শব্দে 'কে' বলেই ধড়মড় করে উঠে বসলো অবাক হয়ে।

তা'র চোখেমুখে স্বপ্নের বিহ্বলতা!

একি! একি তা'র স্বপ্নের কামনা মূর্ত্তি হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে? এ কি সম্ভব? এই খানিকটা আগেও তো নীচে ঘুরে বেড়িয়ে এসেছে কল্যাণী, বাড়ীর কর্ত্তার প্রত্যাগমনের বার্ত্তা তো শোনেনি!

—অবাক হয়ে যাচ্ছো বুঝি?—বিভূতি লাহিড়ী হাসলেন—তবু

রক্ষে, চেঁচামেচি করে লোক জড় করোনি। শুনলাম শরীর খারাপ, কি হয়েছে?

—কিছু না!

'কিছু না' বলে কল্যাণী খাট থেকে নামতে যাচ্ছিলো, বিভূতি ঈষৎ ব্যস্তভাবে ওর কাঁধটায় একটা হাত রেখে বলে উঠলেন—নামছো কেন, শুয়ে থাকো শুয়ে থাকো! 'কিছু না' বলে উড়িয়ে দিতে চাইছো, কিন্তু আগেই রিপোর্ট পেয়েছি আমি। শরীর খারাপ না হলে তুমি এমন ভাবে ঘুমিয়ে পড়তে না। কি হয়েছে? জ্বর?

উত্তর দেবে কি, কল্যাণীর শরীর, মন, বুদ্ধি, চিন্তা সব কিছু যে অবশ হয়ে যাচ্ছে। এমন কি মাথায় কাপড়টা তুলে দেবারও ক্ষমতা খুঁজে পাচ্ছে না।

—একটু বসতে অনুমতি দেবে?

কল্যাণী যেন দিশে খুঁজে পাচ্ছে না। এ কি পরিহাস, না নতুন কোন শাসন? তবু ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে বসলো জায়গা ছেড়ে দিয়ে।

বিভূতি খাটের একপ্রান্তে বসে পড়ে কোমল হাস্যে বললেন—কতোদূর থেকে কতো কষ্ট করে এলাম, কই নিজে থেকে তো একটু বসতে বললে না?

নির্ব্বাক প্রতিমার মুখ থেকে এবার কথা বার হলো।

কল্যাণী সহজে কথা বলে না, কিন্তু যখন বলে—স্পষ্টই বলে।

—আপনাকে বসতে বলি এতো সাহস কোথা?

—সাহস? তাই বটে! সাহস হয় না। আমাকে শুধু ভয়ই করা চলে, না কল্যাণী?

কল্যাণীও আনাড়ি যন্ত্রী বৈকি, নইলে এমন করে সুরবাঁধা তার ছেঁড়ে? অমন মধুর অমন আবেগপূর্ণ প্রশ্নের এই উত্তর জুটলো তার? উত্তরই বা কোথা? সম্পূর্ণ অবান্তর একটা কথা। খাট থেকে নেমে পড়ে

খাটের রেলিং ধরে পাশে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে বললো—আপনি অনেক ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, স্নানাহারের বেলা বয়ে যাচ্ছে।

যেন একটি রঙিন পৃষ্ঠপটে কোন অবোধ শিশু কালি ঢেলে দিলো!

বিভূতি লাহিড়ীও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—ঠিক বলেছো কল্যাণী, ক্লান্তই হয়েছি বটে! 'বেলা বয়ে গেছে' সে কথাটা ভুলে যাচ্ছিলাম।

আর কোনোদিকে তাকালেন না, ভারী পর্দাটা ঠেলে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে মনে হলো—হ্যাঁ স্নানের দরকার রয়েছে, কিন্তু আহার? নাঃ।

নিষেধ শুনে ক্ষুব্ধ রামগতি বললো—আপনি সিঁড়িতে উঠতে না উঠতে 'বাসমতী আতপের' ভাত চড়িয়ে দিলাম বাবু, আপনার চান হতে হতে তৈরি হয়ে যেতো—খাবেন না?

—কি করি, এতো অবেলায় খেতে যে মোটে ইচ্ছে করছে না।

কিছুক্ষণ খাটের বাজু ধরে শুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কল্যাণী বেরিয়ে এসেছিলো। সিঁড়ির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কথাটা শুনতে পেয়েই ফের ফিরে গেলো।

বিছিয়ে দিলো নিজেকে বিছানার ওপর! কেন? কি প্রয়োজন ছিলো এর? কি জন্যে এসেছিলেন বিভূতি লাহিড়ী? এ কী তাঁর অকারণ এক নিষ্ঠুর খেয়াল? না কি পাথরের দেবতার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা? হায়! কল্যাণী যদি নিজেকে প্রকাশ করে বসতো, যদি এইটুকু আহ্বানেই কৃতার্থ হয়ে ধরা দিতো, তাহলেই কি শ্রদ্ধা পেতো, সম্মান পেতো?…এ দুর্ব্বলতা দূর হয়ে গেলেই পাষাণদেবতা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতেন নাকি?

এমনি করেই মানুষ জীবনের অঙ্ক ভুল কসে, এমনি করেই জীবনের ছন্দে ছন্দপতন ঘটায়।…একটি মাত্র সংখ্যার গরমিলে আগাগোড়া অঙ্ক ভুল হয়ে যায়, একটি মাত্র অক্ষরের ঘাটতি-বাড়তিতে ছন্দ নষ্ট হয়।

—ফের সেই উমাদের বাড়ী ? ফের সেই বই ?

হাতের গামছাখানায় প্রচণ্ড এক ঝাপটা মেরে ভিজে চুলগুলো ঘসে ঘসে মুছতে মুছতে তরুবালা তীক্ষ্ণস্বরে বকে ওঠেন মেয়েকে—ফের তোমার উমার কাছে বইয়ের দরকার ? রোসো, একখুনি জিগ্যেস করছি ওঁকে, কি কি বই কিনে দেননি মেয়েকে !

তরুবালাকে দোষ দেওয়া যায় না, তাঁর সহ্যশক্তির ওপর বড্ডো যে চাপ দিয়ে ফেলছে মণি। অথচ মণিরই বা এতো বিষয়বুদ্ধি কোথা যে নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন করবে ?

চিঠির উত্তরের প্রত্যুত্তর এলো কিনা, এ দেখতে হলে উমাদের বাড়ী যাওয়া ছাড়া গতি নেই, তার কারণ এদিকে চালাকী করে উমাদের বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিলো চিঠির মাথায়। কিন্তু তরুবালার অপছন্দকর "উমাদের বাড়ী" যাবার জন্যে জোরালো কারণই বা কি দর্শানো যায় ?

কারণের মধ্যে কারণ তো ওই বই।

বাবাকে জিগ্যেস করার কথায় প্রমাদ গণে মণি। বলে ওঠে—বই কিনে দেননি কে বলেছে ?···একটা 'এসে' লিখবো তাই—ইয়ে—ওদের বাড়ীতে একখানা বইতে দেখেছিলাম, মানে—পড়ার বই নয়—

তরুবালা সান্দিগ্ধভাবে বলেন—কিসের 'এসে' ?

—ইয়ে—মানে, "আমি কি হতে চাই" এই নিয়ে ইস্কুলে একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে তাই—

—তুই কি 'হতে চাস', সেকথা বইতে লেখা আছে ?

—আহা ঠিক কি তাই ? একটু উল্টোপাল্টা—

তরুবালা গামছাখানা কসে নিংড়োতে নিংড়োতে বলেন—'উল্টোপাল্টা'

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাক—বই দেখে 'টুকে মারবার' কোনো দরকার নেই, যা পারো নিজেই লেখো। উমাদের বাড়ীতে তোমার যাওয়া হবে না। অনেকদিন বলেছি তোমাকে—ওরা বড়োলোক, ওর সঙ্গে এতো বন্ধুত্ব কিসের? বিয়ে আর বন্ধুত্ব—এ দুটোই হয় সমানে সমানে! মিথ্যে কোনো আশার খেলায় মেতে, নিজের ও ক্ষেতি কোরো না, আমাদেরও লোকের কাছে হাস্যাস্পদ কোরো না।

এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন তরুবালা।

নিখিলের সম্বন্ধে মেয়ের মনে যদি কোনো দুরাশা জেগে থাকে তো তার মুখে কুঠার হানাই ভালো।

কিন্তু মণি যে নিরুপায়।

শুধু যে চিঠি এসেছে কিনা জানতে যাওয়া, তাও তো নয়। যদি উমাদের বাড়ীতেই অপর কারো হাতে পড়ে যায়? যদি তারা এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়? যদি কৌতূহল প্রকাশ করে তরুবালার কাছে প্রশ্ন করে পাঠায়—এ ব্যবস্থা কেন?

তাই জোর সংগ্রহ করে বলে—তোমার সব যতো বাজে কথা! এতে আবার হাস্যাস্পদ কি? বরং উমার মা বলেন—"উমা তোমার এতো বন্ধু, এক গাড়ীতে গেলেই পারো? ও তোমাকে তোমার স্কুলে নামিয়ে দিয়ে, নিজের স্কুলে চলে যাবে—"। আমিই শুধু তোমার ভয়ে 'না না' করি।

—কি করবে বাছা, মায়ের মৃত্যুর আগে আর নির্ভয় হতে পারবে না। আমি কিছু বারণ করতে চাইনে, খুসি হয় যাও।

—মা আজকের দিনটি শুধু—মণির কণ্ঠে করুণ মিনতি।

উমার বাড়ীতে তার কোনো দাদা থাকলে অবশ্য এ মিনতিতেও গলতেন না তরুবালা, নেহাৎ 'শূন্য পুরাণ' বলেই শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয়ে

যান। বেজার মুখে বলেন—আচ্ছা আজ যাবে যাও—

ব্যস্, আর মণিকে পায় কে?

কিন্তু কই?

এতো চেষ্টা এতো কাণ্ড সবই বৃথা হলো যে। কোথায় চিঠি? 'হতাশার দুঃখ কিশোর মনে যেমন বাজে, এমন বোধহয় আর কোনো বয়সেই বাজে না।' তা সে যে কোনো কারণেই হোক।

জ্বালা! জ্বালা! অসহ্য কষ্ট। জ্বালার দাহ!

শান্ত স্থির সহিষ্ণু কল্যাণীর মধ্যে একি আগ্নেয়গিরি লুকোনো ছিলো? কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না এ অবস্থা, মানিয়ে নেওয়া যায় না নিজেকে।

না জানি দাসদাসীরা কি যে ভাবে!

তাদের সামনে কোনো সময়েই যাতে পড়তে না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টার অন্ত থাকে না কল্যাণীর! কিন্তু কতো আর পালিয়ে বেড়ানো যায়? অপরের কাছে, নিজের কাছে?

তার চাইতে একেবারেই পালানো যায় না?

চলে যাওয়া যায় না নিজেকে মুছে দিয়ে?

ঠিক আর একদিনের মতোই অপরাহ্নের মুমূর্ষু আলোয় জানালার কাছে বসেছিলো কল্যাণী বেতের সেই মোড়াটা পেতে। আজ হাতে কোনো সেলাই নেই, রয়েছে একখানা বই। কিন্তু সেটা বন্ধই পড়ে আছে কোলে।

সহসা পিছন থেকে বিভূতি লাহিড়ীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠলো। অশান্ত অস্থির কণ্ঠ।

—একটা কথা বলার দরকার ছিলো।

—দরকার! কল্যাণীর কাছে আবার বিভূতির দরকার কি থাকতে পারে? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো কল্যাণী।

—বলতে এসেছিলাম—নিখিলের চিঠি এসেছে, ও কলকাতা থেকে আশ্রমে এসেছে, সঙ্গে কোন প্রফেসারের স্ত্রী নাকি। ও আমায় চিঠি লেখেনি, লিখেছে সরকার মশাইকে।…হ্যাঁ…ঠিকই করেছে ও। লিখেছে—এখানে আসছে—কিন্তু আমি তা চাই না।

দৃঢ়বদ্ধ দুই বাহু বুকের ওপর রেখে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন বিভূতিবাবু—না আমি তা চাই না। আমি চাই না আর কেউ এখানে আসুক। কেউ আমার নির্ব্বাসন দণ্ডের সাক্ষী থাকুক এ আমি চাই না।

—কি করবেন তাহলে? নিখিলকে নিষেধ করে পাঠাবেন?

—নিষেধ? না, না, সে কথা তো বলিনি। আমি……আমিই কয়েক দিনের জন্যে চলে যাবো। হয়তো—ঝাড়গ্রামে, হয়তো বাঁকুড়ায়।

—পালিয়ে যাবেন?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, পালিয়েই যাবো। নিখিলকে মুখ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই।

—তবে কেন, তবে কেন আপনি?

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে কল্যাণী। যে চাপাকান্না এতোক্ষণ সঞ্চারিত হচ্ছিলো তার দেহে মনে, শিরায় শিরায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন বিভূতিবাবু ওই ক্রন্দনরত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে। আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে কোমল দেহ, কোলের ওপর জড়োকরা দুইহাতের ওপর মুখ রাখা।

কোথায় গেলো কল্যাণীর সেই নির্ম্মল প্রশান্তি?

আরো একদিন এমনি করে কেঁদেছিলো সেবাশ্রমের বাড়ীতে। যেদিন বিভূতিবাবুর ছবি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলো—বিভূতিবাবুর সামনে, শৈল মাসীর সামনে।

সেদিন বিভূতিবাবু অবাক হয়েছিলেন, মর্ম্মাহত হয়েছিলেন।

আজ কেমন একটা হিংস্র তৃপ্তি অনুভব করেন, সাধু ব্যক্তির পক্ষে যা নিতান্তই বেমানান।

বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করেন এ দৃশ্য।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় সেই হিংস্রতা। স্নেহশীল চিত্ত অপূর্ব্ব মমতায় ভরে আসে। কাছে এসে ওর মাথার ওপর একখানি হাত রেখে বলেন—কল্যাণী, চুপ করো।

কিন্তু চুপ করবে কে ?

এটুকু স্নেহ কোমল স্পর্শে বঞ্চিত হৃদয় আরো উদ্বেল হয়ে ওঠে। ......কিন্তু একি স্বামীর স্পর্শ না করুণার্দ্র চিত্তের মমতা স্পর্শ মাত্র ?

নিজেকে সংবরণ করে উঠে দাঁড়ায় কল্যাণী।

বিচারকের সামনে সাহসী অপরাধীর মতো।

—চলো কল্যাণী, তুমিও চলো! আমরা দু'জনেই পালাই।

—না।

—না ? এখানে একা তোমাকে রেখে যেতেও যে—

—এখানে থাকবো না।

—এখানে থাকবে না ? এ ক'দিন আশ্রমে গিয়ে থাকতে চাও তাহলে ?

—তাও না।

—তাও না ? তবে ?

—আমি চলে যাবো। আপনাকে মুক্তি দিয়ে যাবো।

—কি ছেলেমানুষের মতো কথা বলছো ? ওরা আমার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে আশ্রমে রেখে আসার নির্দেশ দিয়ে তবে আমি যাবো।

—আমার জন্যে আর কোনো ব্যবস্থাই আপনাকে করতে হবে না। মস্ত একটা ভুল করে ফেলে অনেক ক্ষতি করেছি আপনার, অথচ নিজেরও কোনো লাভ হলো না। কিন্তু এখনো চলে গেলে আপনার কিছুটা লোকসান বাঁচবে। লোকে দু'দিন পরে ভুলে যাবে।

—পাগল তুমি কল্যাণী ?

—আর, অহরহ নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ানোই কি খুব সুস্থতার

লক্ষণ? ভেবেছিলাম—আপনি অনেক বড়ো, অনেক মহান, এটুকুতে আপনার ক্ষতি হবে না। বড়ো ভুল ভেবেছিলাম।…দেখছি মহতেরই বড়ো সহজে ক্ষতি হয়। সে ক্ষতির বোঝা বওয়া তাঁদের সাধ্য নয়। আপনার শান্তির জীবনে, সম্ভ্রমের জীবনে, আমার এই অনধিকার প্রবেশের অপরাধ, যদি কখনো সম্ভব হয় ক্ষমা করবেন।

কি উত্তর দেবেন বিভূতিবাবু?

ওর সমস্ত বাচালতাকে মূক করে দিয়ে কঠিন আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট করে বলবেন—তুমি কি ভাবো মুক্তিটাই আমার কাম্য?…নাকি ওর ওই অশ্রু ছল ছল মুখখানি দু'হাতে তুলে ধরে বলবেন—বৃথা অভিমান কেন তোমার কল্যাণী? তুমি কি আমার ভেতরের দ্বন্দ্ব একটুও বুঝতে পারো না?

একটা যা হোক। দুইয়ের যে কোনো একটা যদি করতে পারতে তুমি বিভূতি, এখনি সব সহজ হয়ে যেতো। সব সমস্যা মিটে যেতো। সব চিন্তার শেষ হতো।

কিন্তু তা হয় না।

বিভূতি লাহিড়ীর সমস্ত চিন্তাকে গ্রাস করে রয়েছে নিখিল!

নিখিল এসে পড়বে! কাল হোক পর্শু হোক!

তখন?

সেই সমস্যাহীন নিশ্চিন্ত জীবন নিয়ে নিখিলের সামনে দাঁড়াতে পারবেন তার বাপ বিভূতি লাহিড়ী? মৃন্ময়ী সেবাশ্রমের দেবতা?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর ভরে গেছে, জানলার রেলিঙ্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী, ঘরময় অস্থির পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন বিভূতি লাহিড়ী, সহসা বাইরে থেকে 'বাবু' ডাক শুনে চমকে উঠলেন।

—কে?

—আজ্ঞে আমি কেষ্ট।

—কি বলছিস ?

—আশ্রম থেকে দাদাবাবু এসেছে, একটা মেয়েছেলেকে সাথে নিয়ে।

—বাবা।

—বলো!

—বাবা!

—তিরস্কারের ভাষা খুঁজে পাচ্ছো না, কেমন ? বলো বলো ভাষায় যতো তিক্ততা থাকতে পারে, যতো রূঢ়তা থাকতে পারে, সব দিয়ে ধিক্কার দাও নিখিল! কোনো ভয় কোরো না। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই না আমি, বিচারই চাই।

—আমি তো আপনাকে বিচার করতে আসিনি বাবা!

পুরুষের ঠোঁটও কেপে ওঠে ?

পুরুষের চোখেও জল গড়িয়ে পড়ে ?

কাঁপা ঠোঁটে আবার বলে নিখিল—আমি আমার মাকে দেখতে এসেছি।

—নিখিল! তুমি কি আমাকে করুণা করছো ?

—বাবা, এতোদিন পরে এলাম কি আপনার কাছে শুধু শুধু বকুনি খাবো বলে ?

কল্যাণীকে পারা যায় না, নিখিলকে পারা যায়।

দুইহাতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর মাথার ওপর মুখটা রাখেন বিভূতিবাবু।

—চলুন বাবা।

—একটু পরে নিখিল। তাকে একটু প্রকৃতিস্থ হতে সময় দিতে হবে। এইমাত্র আমি তাকে কঠিন ধিক্কার দিয়ে এসেছি। সে-সে, তোমার নতুন মা, মৃন্ময়ীর মতোই অভিমানী।

কিন্তু কল্যাণীর অভিমান কি মৃন্ময়ীর মতো মূল্যবান? তার নিজের মনে কি সে মূল্যবোধ আছে? তা যদি থাকতো, সে কি এমন করে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে চলে যেতে পারতো? তোমাদের পিতা-পুত্রের মাঝখানে ব্যবধানের প্রাচীর হয়ে থাকবার লজ্জায় সে সরে গিয়েছে।... এখন তোমরা তোমাদের মহত্ত্ব নিয়ে 'হায় হায়' করে বেড়ালেও তার কোনো উপকার হবে না।

অথচ নিখিলই বা মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়?

—অবাক হয়ে গেলাম নিখিল, যখন দেখলাম—আমাকেও কারুর প্রয়োজন হ'তে পারে—

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না বলেই হয়তো কথা বলা যায়।

খোলা ছাদে জ্যোৎস্নাহীন আকাশের নীচে দুই বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন বিভূতিবাবু, নিখিল কখন এসে নিঃশব্দে বসে আছে খেয়াল নেই। যখন টের পেলেন, যেন প্রস্তুত করে নিলেন নিজেকে, সাহস সঞ্চয় করে নিলেন অন্ধকারে থেকে।

কিন্তু কি এ?

যুবক পুত্রের কাছে বয়স্ক পিতার পদস্খলনের স্বীকারোক্তি? না, নিজের মুখোমুখি বসে নিজেকে বিশ্লেষণ করা?

—সেই রাত্রে—খুব আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—এত রাত্রে একলা আমার ঘরে আসবার সাহস তার কি করে হ'ল, উত্তর দিলে না—শুধু কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিভূতিবাবু। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, কী অদ্ভুত দেখ নিখিল, তোমার বয়সের মেয়ে সে—ছেলেমানুষ বৈ তো নয়—আমাকে তার দরকার হতে গেল কেন? ভাবতাম—আমি 'দেবতা', আমি 'গুরুদেব' এই বুঝি আমার শেষ পরিচয়, এর বাইরে আমার—শুধু 'আমি' বলে আলাদা কোনো মূল্য আছে, এ তো কোনোদিন খেয়াল করিনি।···তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে সারারাত্রি ঘুম হ'ল না···অনেক ভাবলাম···ভেবে আর কূলকিনারা পাইনে। কল্যাণীর মত মেয়ে, আশ্রমের রত্ন বললেই হয়, ধীর-স্থির, শান্ত-নম্র, অদ্ভুতকর্ম্মী, চমৎকার স্বভাব—কোনোদিন কাণে আসেনি

ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, ও হঠাৎ এমন করলে ?…এ কি আমারই অসাবধানতার ফল ? তার সদ্‌গুণের জন্যে যদি বিশেষ কোনো প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে থাকি তা'কে, সে কি অন্যায় করেছি ? কার দোষ ? কার ভুল ? কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। সারারাত্রি শুধু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম।…পরদিন শৈল মাসী এসে বললেন—"কল্যাণী চ'লে যাবে।" চমকে গেলাম—চলে যাবে—একথা তো ভাবিনি…জানতে চাইলাম—'কেন' ?…

আবার এক মুহূর্ত্ত চুপ করে যান বিভূতিবাবু। পরক্ষণেই—যেন সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে সহজ গলায় বলেন—শৈলমাসী বললেন—'ও তোমায় ভালবাসে'। নিজেকে তৈরী করেছি বলে ভারী গর্ব্ব ছিল নিখিল, কিন্তু তবু পরের মুখে এরকম স্পষ্ট কথা শুনে একটু কেঁপে উঠলাম বৈকি।… তবু বললাম—যা বলা উচিত—বললাম—'আমাকে তো সব্বাই ভালবাসে।' শৈলমাসী রেগে উঠলেন—বললেন—'নিজেকে নিজে ঠকাস্‌নে বিভূতি, ভালো তো তুইও সব্বাইকে বাসিস্, তবু কি কল্যাণীর মতন ? কল্যাণী চলে গেলে তোর আশ্রম শূন্য হয়ে যাবে না ? মহালক্ষ্মী চলে যাওয়ার মত সহজ মনে অনায়াসে নিতে পারবি ?'—উত্তর দিতে পারলাম না।…তারপর আশ্রমের সংশ্রব ত্যাগ করে চলে এলাম কল্যাণীকে নিয়ে। সবাই জেনেছিল আমার অধঃপতনের ইতিহাস, শুধু তোমার কাছেই কী যে এক সঙ্কোচ—

বিভূতিবাবু চুপ করে গেলেন।

এতক্ষণ পরে নিখিল কথা বললে—কিন্তু হঠাৎ এভাবে চলে গেলেন কেন তিনি ?

—হয় তো আমারই দোষ।

চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরের গভীর ব্যথার সুর গোপন করতে পারলেন না বিভূতিবাবু।

—তাকে নিয়ে এলাম—কিন্তু মেনে নিতে পারলাম না—দীর্ঘকালের শিক্ষা, সংস্কার, অভ্যাস, মৃণ্ময়ীর কাছে অপরাধ-বোধ, অনবরত বাধা দিতে লাগলো···সেটা যে তাকে এত আঘাত করতো বুঝতে পারিনি। তুমি যখন এলে, এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল তার সঙ্গে···সামান্য কথা। হঠাৎ তেমনি করে—সেই প্রথম রাত্রের মত সে কী কান্না।—তারপর তো সবই জানো!

—আমি খুঁজে বার করবোই বাবা।

বাবার পায়ের উপর একটা হাত রাখলো নিখিল।

হঠাৎ বাবার ওপর একটা সকরুণ মমতায় সমস্ত হৃদয় ভরে ওঠে, ছোটরা দুঃখ পেলে যেমন হয় বড়দের—সন্তানের জন্য হয় পিতার। বাবার উপর তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, ভালবাসা ছিল অগাধ, শুধু সাহস ছিল না স্নেহ করবার। কাছে থেকেও যেন অনেক দূরের মানুষ, অনেক উঁচুর, হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবার মত নয়।

বাবার জন্য সমবেদনা—এ একটা নতুন অনুভূতি। ইচ্ছে করছে গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, আদর করে।

ঘৃণা? লজ্জা? রাগ? কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছে না মনের মধ্যে।

কল্যাণীর উপর বিরাগ? তাই বা কই? দু'টি আত্মবঞ্চিত নরনারীর প্রেমের ব্যথা যেন নিজের অন্তরে অনুভব করতে থাকে নিখিল।

নিমীলিত দুই চোখের প্রান্ত বেয়ে দুই বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, সে কার? সে কি কঠোর সংযমী দৃঢ় চরিত্র বিভূতির? অন্ধকার তাই রক্ষা। নইলে—মিহির ডাক্তার শুনলে কি বলতো? কি বলতো ম্যানেজার নৃপেনবাবু গোঁফের ফাঁকে একটু মুচ্‌কি হেসে?

আস্তে আস্তে রাত্রি গভীর হয়ে আসে, কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ উঁকি মারে আকাশের কোণে, অন্ধকার পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

—চল, ঠাণ্ডা লাগছে তোমার—বলে উঠে বসলেন বিভূতিবাবু। চুলের মধ্যে কয়েকবার আঙুল চালিয়ে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—কিন্তু খোঁজ করবার দরকার কি সত্যিই আছে নিখিল? হারিয়ে নষ্ট হয়ে যাবার মত মেয়ে সে নয়। হয়তো এর চেয়ে ভালো পরিণতি আসবে তার জীবনে, সার্থক করে তুলবে নিজেকে।

—আর আপনি?

আচম্‌কা মুখ দিয়ে বার হয়ে যায় কথাটা।

—আমি? ভাবছি, আশ্রমেই ফিরে যাবো আবার।

—কক্ষনো না। আমার মা চাই, খুঁজে আনতেই হবে তাঁকে।

'অবাঞ্ছিত অতিথি' বলে যে কথা আছে একটা, সেটা বলাকা দেবীর সম্বন্ধে যেমন খাটে, অল্পক্ষেত্রেই তেমন হয়। বলাকা নিজেও যে সেটা একেবারে না বোঝেন তা' নয়, তবু কেন যে কলকাতায় ফিরে যেতে চাননা এই এক আশ্চর্য্য রহস্য।......

সকালবেলা বাড়ীর পিছনের বাগানে উপাসনার ভঙ্গীতে বসেছিলেন বিভূতিবাবু নিত্যকার মতই। দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ গড়ন, খদ্দরের চাদরে জড়ানো খালি গা, বুকের একাংশ খোলা, পড়েছে সকালের আলো—বুকে মুখে ললাটে, নিমীলিত দুটি চোখের পাতায়।

ভোরবেলা বেড়ানো অভ্যাস বলাকা দেবীর। ফিরে আসবার বেলায় বাগানের পথে আসতে গিয়ে হঠাৎ যেন স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।...

পুরুষমানুষের এত রূপ? এত রং? রৌদ্রের আভায় আর্শির মত জ্বলে? মনে পড়লো নিখিলের সেই প্রথম দিনকার সগর্ব্ব উক্তি বাবার রূপের হিসাব নিয়ে, নিজেদের বংশগত সৌন্দর্য্যের পরিচয় নিয়ে।

তবু এতটা অনুমান করতে পারেননি বলাকা দেবী। দু'দিন এসেছেন, ভালো করে দেখাই হয়নি ভদ্রলোকের সঙ্গে। সেই প্রথমদিন রাত্রে যা দু'একটি মামুলি অভ্যর্থনার কথা, আর মোমবাতির মৃদু আলোকে দেখা।

এই অগাধ রূপ, অপরূপ সৌন্দর্য্য অবহেলা করে চলে গেছে কল্যাণী? মেয়েমানুষ হয়ে? কিসের আকর্ষণে গেল কে জানে। যে যাই বলুক, কল্যাণীর গৃহত্যাগের অন্য কোন অর্থ স্বীকার করেন না তিনি।

যে মেয়ে একবার ব্রহ্মচারীর তপোভঙ্গ করে নীচে নামিয়ে আনতে পারে, সে যে আবার একবার অন্যায় খেয়াল চরিতার্থ করতে

নিজেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা পাপের পথে, একথা বিশ্বাস করবে কে ?

বলাকা দেবী এত বোকা নন যে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট হবেন— অভিমানভরে পালিয়ে গেছে কল্যাণী! মেয়েমানুষকে তাঁর জানা আছে।

দু'চারবার বাগানে পাক্ দিয়ে বেড়ান—বিভূতিবাবুর ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায়। সত্যিই তো, ভদ্রলোকের এই মনোকষ্টের সময় সান্ত্বনা দেওয়া দরকার নয় কি ? সব মেয়েমানুষই তো আর কল্যাণীর মত হৃদয়হীন নয় ? তাদের মায়া মমতা আছে, হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে।

আলগোছে স্থানভ্রষ্ট দু'চারটি চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে পাউডার মণ্ডিত রুমালখানি ঘাড়ে গলায় বাহুতে বুলিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন।

মানুষের উপস্থিতিই ধ্যানভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে। বিভূতিবাবু ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে উঠে পড়লেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই বলাকা দেবীর কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো—এই যে— পূজোপাঠ সারা হল ?

বলা বাহুল্য বিভূতিবাবুর মনোভাবটা এই সব "প্রজাপতি মার্কা"র উপর কোনো কালেই অনুকুল নয়, এখনকার মনের অবস্থায় তো আরোই নয়। নিখিলের উপর বরং একটু অসন্তুষ্টই হচ্ছিলেন এই রকম উপদ্রব জোটানোর জন্যে। তবু ভদ্রতার খাতিরে সামান্য হেসে বললেন—বেড়িয়ে ফিরলেন ?

—হ্যাঁ, ঘুরে এলাম খানিকটা, সুন্দর জায়গা, বেশ আছেন আপনারা। আমাদের মত ধোঁয়া ধূলো আর লোকের ভীড়ের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠতে হয় না।

অবশ্য কলকাতায় ফিরে গেলে শহুরে সভ্য ব্যক্তিদের কাছে বলবেন উল্টো কথা।—আর বোলোনা, কলকাতার বাইরে আবার মানুষে থাকে? আমাদের তো ভাই পল্লীগ্রামে দু'দিন থাকলেই প্রাণ হাঁফিয়ে আসে।

এসব ছেঁদো কথা বোঝবার মত বুদ্ধির অভাব বিভূতিবাবুর নেই—উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলেন—বেশ, শুনে খুসী হলাম, চলুন বাড়ীর মধ্যে যাওয়া যাক।

—যাচ্ছেন বুঝি আপনি? চমৎকার জায়গাটি কিন্তু, উপভোগ করবার মত। একটু বসলে খুসী হতাম। অবশ্য প্রয়োজন থাকে যদি আপনার—

—না, প্রয়োজন আর এমন কি, নিখিল উঠেছে কিনা দেখি—

—নিখিল? সে তো ভোরবেলা উঠে চলে গেছে কোথায়।

—চলে গেছে?

হঠাৎ চুপ করে যান বিভূতিবাবু···আজকে থেকেই তা'হলে অন্বেষণ সুরু হ'ল? পাগলা ছেলে! যে ইচ্ছে করে হারিয়ে যায়, তাকে খুঁজে বার করা কি এতই সোজা? তা ছাড়া জীবনে যাকে চাক্ষুষ দেখেনি কোনোদিন, তাকে চিনবে সে কোন চিহ্নের সূত্রে?

—এইটি বুঝি আপনার উপাসনার জায়গা?

—কি বললেন?···ও না, উপাসনা আর কি, এমনি বসে থাকি চুপচাপ।

—কিন্তু রীতিমত ধ্যানস্থ হয়েছিলেন আপনি, ঠিক ষ্ট্যাচুর মত, যেন শ্বেত পাথরে গড়া বুদ্ধ মূর্ত্তি।

নিজস্ব বালিকাসুলভ ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি।

হয়তো 'সেবাশ্রমের' প্রতিষ্ঠাতা "ঠাকুর মশাই"কে দেখলে কিছুটা সমীহ করতেন, কিছুটা ভয়, কিন্তু বিভূতি লাহিড়ীকে ভয় কি? যে পুরুষ একবার

স্ত্রীলোকের মোহে পড়ে ইহকাল পরকাল জলাঞ্জলি দিতে পারে, তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তা'ও একটা সাধারণ চেহারার দুঃখী অনাথ মেয়ে! কল্যাণীর রূপের বিবরণ আশ্রম বাড়ীর দু'একটি মেয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন বলাকা দেবী।

প্রগল্ভ স্বভাব একেই তো বিভূতিবাবুর দু'চক্ষের বিষ, তার উপর মেয়েদের। বিরক্ত হয়ে ওঠেন, ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলেন—চলুন যাওয়া যাক্, রোদ উঠে পড়েছে।

কাজলপরা কালো চোখের আলো হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে যেন।

তুলসী তলার প্রদীপ দেওয়া সেরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল সন্ধ্যার অন্ধকারে আবছা হয়ে আসা একটা পাতলা দীর্ঘ ছায়া। চমকে ওঠাই উচিত, কারণ এটুকু শৈলবালার নিজস্ব এলাকা, বড় কেউ এখানে পদার্পণ করে না। তবে ভয় পাবারও কিছু নেই, নিশ্চয়ই কোন প্রার্থী নিরালায় জানাতে এসেছে গোপন প্রার্থনা।

—কে ওখানে?

—আমি।

—কল্যাণী?

চমকে ওঠেন শৈলবালা এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিখিলের পিতৃ-সন্দর্শনের সঙ্গে কল্যাণীর চলে আসার কিছু একটা যোগসূত্র অনুমান করে নিয়ে নরম গলায় বলেন—আয়। একলা এলি বুঝি?

—পালিয়ে এলাম মাসীমা।

—পালিয়ে এলি? কেন বল্‌তো কল্যাণী?

সহজ হবার চেষ্টা করলেও কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ চাপা পড়ল না শৈলবালার।

—রাণীগিরি পোষাল না মাসীমা।

সামান্য একটু হাসির শব্দ শোনা যায়।

—ঘরে আয় কল্যাণী, বোস দিকিন আমার কাছে।

—দাঁড়াও মাসীমা, তোমায় প্রণাম করে নিই আগে।

—ব্যাপারটা খুলে বলতো আমাকে, নিখিল কি কিছু বললে? কিন্তু সে তো তেমন ছেলে নয়—

—তাঁকে তো আমি দেখিনি মাসীমা।

—দেখিস নি? তা'হলে? এখান থেকে তো গেল তোদের ওখানে যাবে বলেই। সঙ্গে সেই এক ধিঙ্গি মাষ্টারগিন্নী! ছেলেটার একটু ইচ্ছে নয় যে তা'কে সঙ্গে নেয়, বার বার বললে—'দুদিন এখানে থাকো, আমি ঘুরে আসি—শুনলে না। পৌঁছয়নি সেখানে?

—আমি কাউকেই দেখিনি মাসীমা, তবে শুনলাম গেছেন দু'জনে।

—শুনেই ভয় পেয়ে পালিয়ে এলি? আচ্ছা মেয়ে তো! এলি কি করে?

—এলাম যা হোক করে, তবে ভয় পেয়ে নয় মাসীমা, হেরে গিয়ে। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে চলে এলাম। যাবার আগে তোমাকে একবার দেখে যাবার বড় ইচ্ছে হ'ল। কাল চলে যাবো।

—কি সব গোলমেলে কথা বলছিস কল্যাণী, বিভূতিকে ছেড়ে চলে এসেছিস নাকি?

—যদি তাই বল তো তাই।

মৃদু হাসলো কল্যাণী।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওর পিঠের উপর একখানি হাত রেখে শৈলবালা ঈষৎ ভৎর্সনার স্বরে বললেন—ভালো করোনি মা, কাল ভোর-বেলাই বিপিনের গাড়ীতে চলে যেও। এ কি ছেলেমানুষী হয়েছে বলতো? তোমার মত বুদ্ধিমতীর কাছে এ রকম কাজ আশা করিনি আমি।

—কি করবো মাসীমা, পারলাম না। এতদিন ধরে অহরহ বুদ্ধির কাছে প্রশ্ন করেছি, উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে থাকে। ভুল করেছিলাম মাসীমা, তখন ভেবেছিলাম—দয়া পেলেই বেঁচে যাই, এখন দেখছি দয়া সহ্য করা বড় কঠিন। তোমাদের কাছে হঠাৎ যেন শনিগ্রহের মত এসেছিলাম—তোমাদের সকলের ক্ষতি করলাম। আর তাঁর? সে

আর বলবো কোন্ মুখে ? নিজের ধৃষ্টতায় দেবতাকে মন্দির থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলাম, কিন্তু অত বড় জিনিস সামলাবো কি করে ? তাই পালিয়ে যাচ্ছি।

শৈলবালা ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আস্তে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—কথাটা খুব মিথ্যে নয় কল্যাণী, ক্ষতি অনেক হল বৈকি। যখন দেখতাম—তোমার নাম শুনলে বিভূতির চোখে আলো জ্বলে ওঠে, তোমার কাজের প্রশংসায় বুক ভরে যায় ওর, দেখতাম চিরদিনের নিয়মী মানুষের গভীর রাত্রি জেগে বাগানে ঘুরে বেড়ানো—তখন মনে হ'য়েছিল এ কি খাল কেটে কুমীর আনলাম। খুব রাগ হল তোর ওপর, ঘৃণা করতে চেষ্টা করলাম! নিজে হাতে করে যখন শুধু তোর জন্যে তাকে বিদায় দিলাম, তখন বার বার ভগবানকে জিগ্যেস করেছি—একি করলাম ? একি করলাম ? তবু এইটুকু সান্ত্বনা ছিল—ওর নিঃসঙ্গ জীবন ভরে উঠেছে, একটু আরামের আশ্রয় পেয়েছে। সকলের মাঝখানে থেকেও সকলের নাগালের বাইরে বড় একলা জীবন ছিল ওর। কিন্তু একি হ'ল বল্ তো ? হেরে পালিয়ে এলি ?

—আমার অক্ষমতা ক্ষমা কোরো মাসীমা।

—তা'হলে এখন কি করবি ঠিক করেছিস ?

—আবার দাদার কাছেই ফিরে যাবো কলকাতায়।

—দাদার কাছে ? যেতে লজ্জা করবে না ?

—লজ্জা তো করবেই মাসীমা। কিন্তু লজ্জার কাজ করবো আর তার গ্লানিটা এড়িয়ে যাবো, এ কি হয় ? আশীর্ব্বাদ করো আর যেন লজ্জায় পড়বার কাজ না করি।

—আবার সেই মাষ্টারী করবি ?

—অন্য কিছু কাজ তো শিখিনি মাসীমা।

—কিন্তু কেনই বা তুই খেটে খাবি কল্যাণী? সিঁদুর যখন পরেছিস, তখন বিভূতি অন্ততঃ তোকে ভাত দিতে বাধ্য। তোর কলকাতার ঠিকানা—

—ছিঃ মাসীমা।

'ছিঃ'! সে কথা শৈলবালাও উচ্চারণ করেই অনুভব করেছিলেন, তবুও কল্যাণীর ঐ অসহায় ম্লান মুখ এত পীড়িত করতে থাকে যে এমন অসম্মানকর প্রস্তাবও মুখে এসে পড়ে।

—তাহলে কার সঙ্গে যাবি কলকাতায়? ডাক্তার বাবু শুনছি পর্শু—

—তুমি এক পাগলা মেয়ে শৈলমাসি, কার সঙ্গে আবার যাবো? একলাই তো এসেছিলাম।

মল্লিনাথ ক'দিন ধরে দারুণ চটে আছে। দিদির যে কী হয়েছে, কিছুতেই আর দিদির নাগাল পাচ্ছেনা সে।

খুনসুড়ি করে করে ঝগড়া বাধাবার এত চেষ্টা করছে—কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছে না। হঠাৎ এত উদার পরমহংস হয়ে ওঠবার কারণ কি? এমনি থেকেই নিজের খাতা পেনসিল বিলিয়ে দিচ্ছে, ফাউন্টেন পেনে হাত দিলে চুলের মুঠি ধরছে না, এমন কি লুকিয়ে 'কুপথ্যি' জোগাড় করে আনবার জন্যে মল্লিনাথের হাতে পায়ে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সেদিন নিজে থেকেই 'ঝালবড়া' নিয়ে এসে সেধে দিতে গেল মল্লিনাথ, স্বচ্ছন্দে বলে বসলো—'তুই খেয়ে নে ভাই, আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না'।

বেড়ালের মাছে অরুচি!

কার্য্য কারণ সম্বন্ধে যথার্থ বোধ না থাকলেও দিদির এই ভাবান্তরের সঙ্গে নিখিলবাবুর যে কিছু একটা যোগাযোগ আছে এইটা আন্দাজ করে পরম প্রিয়পাত্র নিখিলবাবুর উপর সুদ্ধ রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠে।

দিদি 'বড়' হয়ে গেলে তার আর রইল কি?

সত্যি তর্কচূড়ামণিরও দোষ আছে বৈকি। কি দরকার ছিল ওর প্রেমে পড়তে যাবার? এখন নিজেকেই যে নিজে সামলাতে পারছে না। পরীক্ষা আসন্ন, পড়া তৈরি হচ্ছে না, অঙ্ক কষতে বসে হঠাৎ সমস্ত সংখ্যাগুলো অর্থহীন একাকার হয়ে যায়, রচনা করতে গিয়ে সাদা কাগজের পিঠে লিখতে ইচ্ছে করে সম্পূর্ণ অবান্তর কথা, ইংরাজি বই খুলে মানেগুলো বোধগম্য হয় না।

এদিকে তরুবালা সাতবার ডেকে সাড়া পাচ্ছেন না, সুরেশবাবু কোর্টে

যাবার সময় দেখেন কাগজপত্র গোছানো নেই, পানের ডিবে খালি। মেয়েটাই যে কোথায় কোথায় থাকে, দেখতে পাওয়া দায়।

প্রতিপদে কেন এত ভুল ?

শৈশব ছন্দে গাঁথা সাজানো দিনগুলি যেন ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়েছে অকস্মাৎ যৌবনের দমকা হাওয়ায়। তরুবালার হাতে গড়া এই ছোট সংসারের খাঁজকাটা খুপরিতে যেন ওকে আর আঁটছে না।

প্রতিপদে ধরা পড়ছে সেই অসঙ্গতি ।

আজকে মল্লিনাথ শেষ চেষ্টা দেখবে—দিদি বড় হয়ে যেতে পারে, ও পারে না ? দাদার মত গুরুগম্ভীর চালে এসে বললে—এই দিদি, আজকাল তোর কি হয়েছে বলতে পারিস ?

—হবে আবার কি ?

মণি চকিত হয়ে ওঠে।

—হরদম কিসের ভাবে বিভোর হয়ে থাকিস ?

—ভাবে বিভোর আবার কিরে অসভ্য ছেলে !

—তা'হলে আগে মাকে বলগে যা—'অসভ্য মেয়ে'। মা নিজেই বলছিলেন বাবার কাছে।

—বাবার কাছে ?

লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে মণি—বাবার কাছে আবার কি বলতে গেলেন ? মার যত সব ইয়ে—বাবাঃ ।

—মার তো সবই 'ইয়ে', আর তোর নিজের কিরে ? সকাল থেকে পড়তে বসেছিস ? পড়তে তো ছুটি দিয়েছে ইস্কুলে—

—এই তো এবার পড়বো রে, সব ঠিকঠাক করে নিচ্ছি,—বলেই মণি অকস্মাৎ বই খাতা কাগজ কলম টানাটানি করে রীতিমত কর্ম্মব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—থাক্ হয়েছে, যা পড়বি সে তো মা সরস্বতীই জানছেন, বই খুলে হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেই যদি পরীক্ষার পড়া তৈরী হ'ত তা'হলে আর ভাবনা ছিল না। সমস্ত আকাশটাই নক্ষত্র লেগে ক্ষয়ে যেত, কেউ পড়ত না।

—আকাশে আবার কি দেখি তাই শুনিরে দুষ্টু ছেলে? একদিন কবে একটা ঘুড়ির লড়াই দেখছিলাম—

—আজকেও বুঝি সারা সকাল ঘুড়ির লড়াই দেখছিলি? মা গঙ্গা নাইতে যাবার সময় কি বলে গিয়েছিলেন মনে আছে?

—মা? কই কিছু তো বলেন নি—অ্যাঁ? ওই যাঃ, বিষ্টি হয়ে গেছে না? আমড়ার আচার—

ছুটন্ত দিদিকে ধরে ফেলে মল্লিনাথ।

—এখন আবার কি তুলবি? সে সব আমড়ার আচার ভিজে গোমড়া হয়ে বসে আছে। মা এসে দেখে রেগে আগুন একেবারে। বাবাকে গিয়ে খুব বকে দিলেন।

—বাবাকে কেন? বাবা কি করলেন?

ভারী মুষড়ে পড়ে বেচারা 'তর্কচূড়ামণি'—তর্কের স্পৃহা পর্য্যন্ত ঘুচে যায় তার।

—'বাবা তোর বিয়ে দিচ্ছেন না, পাশ করাচ্ছেন। ম্যাট্রিক পাশ করেননি বলে মার বিয়ে হয়নি না কি' এই সব। যেমন না ধিঙ্গি মেয়ে তুমি।

—বাঃ রে বা, কি করেছি আমি? একবার একটু ভুলে গিয়েছি বলে—

অবাধ্য অশ্রু আর লজ্জা সরমের ধার ধারেনা, ঝরঝর করে ঝরে পড়ে।

শুধুই তো আর অপদস্থ হওয়ার লজ্জা নয়?

নাম-না-জানা যে 'মনকেমনে'র ভার জমাট মেঘের মত থমকে ছিল ছোট্ট মনটুকুর ভেতর, বাইরের একটু আঘাতের অপেক্ষাই করছিল যে সে! নইলে—অতটুকু মানুষ এত ভার বইবে কেমন করে?

অমূল্যকে পিঠে বেঁধে সাইকেল চড়ে উধাও হয়ে যাওয়ার পর থেকে মিহির ডাক্তারকে আর দেখতে পাইনি আমরা, হঠাৎ দেখা গেল কলেজ ষ্ট্রীটে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে।

আচম্‌কা আকাশ থেকে পড়েননি অবশ্য, ট্রেনে চড়ে ভদ্রভাবেই এসেছেন, দেখাটা অপ্রত্যাশিত এই যা।

পাতলা ধুতি পাঞ্জাবী পরা পরিচ্ছন্ন ভদ্রবেশ, হাতে একটা বইয়ের প্যাকেট। নীল ফিতে বাঁধা ব্রাউন পেপারের মোড়কের উপর "বসন্ত পাবলিশিং হাউসে"র ছাপমারা। মোড়ক খুললে দেখা যেত আলাদা আলাদা বই নয়, একই উপন্যাসের একাধিক কপি।

কয়েকটা জরুরী ওষুধ কিনতে আর 'বসন্ত পাবলিশিং হাউসে'র গহ্বর থেকে "বিক্রমাদিত্যে"র সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস "ছায়াছবি" খানা উদ্ধার করতে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছেন মিহির ডাক্তার।

এই এক সৃষ্টিছাড়া গাফিলি এদের। বইটা বার করে বাজারে ছাড়বার তাড়া একতিল নেই। 'হচ্ছে হবে' ভাব কর্তা থেকে দপ্তরীটির পর্যন্ত। যা কিছু গরজ লেখকদের।

বইটা ছাপা শেষ হয়েছে—এ খবর পেয়েছেন মাস দুই আগে, অথচ একবার দপ্তরী সাহেবের হাত ঘুরিয়ে বাজারে ছেড়ে ফেলবার ফুরসৎ এঁদের এখনো হচ্ছিল না। "বাহির হইতেছে" বলে যে আরো কতদিন বিজ্ঞাপন চালাবার ইচ্ছা ছিল কে জানে? চিঠি লিখে লিখে হয়রাণ হয়ে অবশেষে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'তেই হ'ল। এই তিন দিনের তাগাদায় অনেক কষ্টে এই কয়খানা বই টেনে বার করতে পেরেছেন।

'বিক্রমাদিত্যে'র নিজের ভাষায় "ঔপহারিক" সংখ্যা।

দু'চারখানা ট্রাম ছেড়ে দিয়ে একখানায় চড়ে বসতে সক্ষম হলেন—অনেক যুদ্ধ অনেক কসরতের জোরে। বাসের চাইতে অপেক্ষাকৃত সহনীয় হলেও ট্রামও অসহ্য হয়ে উঠেছে আজকাল। বিশেষ করে যারা বাইরে থেকে আসে তাদের কাছে!

নিজেকে কোনো রকমে একটু প্রতিষ্ঠিত করে বইয়ের প্যাকেটটা কোলে নিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখেন নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল কলকাতার দিকে।···

পাঁচবছর হ'ল মিহির ডাক্তার কলকাতা ছেড়েছেন, কিন্তু এই পাঁচ বছরের ইতিহাস কী অদ্ভুত ঘটনাবহুল! বছরে দু'একবার করে আসেন, প্রত্যেকবারই দেখেন এক এক নতুন লীলা। অবশ্য বাইরে থেকে যতটা শুনে আসেন ততটা মারাত্মক নয়, তবু ভয়াবহ বৈকি!

চলন্ত গাড়ীর দুপাশের দৃশ্য বদলাচ্ছে·····ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু চোখে পড়ছে না কিছু, পাল্লা দিয়ে চলছে নিজের মনের গতি।···

ইভ্যাকুয়েশন! ইভ্যাকুয়েশন! অশ্রুতপূর্ব্ব এই শব্দ যখন প্রথম শুনলো লোকে, কম ভয়াবহ সেই দিন?

এতবড় শহরটাকে কে যেন শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিলে।

তারপর আবার এসেছিলেন······তখনো আতঙ্কগ্রস্তের দল ফিরে আসেনি, শূন্য প্রেতপুরীর মত খাঁ খাঁ করছে কলকাতা শহর, শাড়ীহীন বাড়ীগুলো ন্যাড়া শিমুল গাছের মত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে—সমস্ত শোভা সৌন্দর্য্য হারিয়ে।······আকাশে বোমা, বাতাসে সাইরেণ, পথে দুরন্ত দৈত্য। জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে শুধু মৃত্যুর ষড়যন্ত্র চলছে।

সে দৃশ্য বদলালো······এসে দেখলেন লোক ধরে না কলকাতায়। পথে ঘাটে যানে বাহনে প্রাসাদে বস্তীতে শুধু ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি।

যেখানে বিশ লক্ষ লোককে কুলোচ্ছিল না, সেখানে বেয়াল্লিশ লক্ষর উপর আরো বাড়ছে।

জলস্রোতের মত যে বিপুল জনস্রোত ভুতুড়ে দেশটাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার চতুর্গুণ এসে গেছে।

পরের বার এলেন কণ্ট্রোলের দৃশ্য দেখতে।

শেষ এসেছিলেন সেই বিখ্যাত মন্বন্তরের সময়······

সেই নাটকীয় দৃশ্য দেখে যাবার পর আর আসবার ইচ্ছা ছিল না···তবু আসতে হ'ল! আস্তে আস্তে সেই জোরালো বিতৃষ্ণাটা কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাই সামান্য ছুতোতেই আসাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো।

যতই হো'ক তবু কলকাতা! ইচ্ছে করলেই তুমি ফুটপাথে পড়ে থাকা মড়াটাকে ডিঙিয়ে যে কোনো একটা সিনেমায় ঢুকে পড়তে পারো। সামান্য কিছু মূল্যের বিনিময়ে—গদি আঁটা চেয়ারে বসে "পোটেটো চিপ্‌স্" চিবোতে চিবোতে, আর আইসক্রীমের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে, মিলনাত্মক একখানি প্রেমের দৃশ্য দেখে ভুলতে পারো পৃথিবীর নারকীয় লীলা।

রাস্তার দুধারে অসংখ্য কাপড়ের দোকানে রঙে রূপে বিকশিত শাড়ীর সমারোহের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলেন ডাক্তার—খবরের কাগজের হেডিংগুলোর কথা······"বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা", "কুলনারীর পতিতাবৃত্তি", "লজ্জা নিবারণার্থে লজ্জাত্যাগ"···কোন্ বাংলাদেশের কাহিনী এ সব? কলকাতা কি সেই বাংলাদেশের অন্তর্গত নাকি?

একটানা চিন্তার স্রোতে ধাক্কা খেয়ে গেল, এসপ্ল্যানেড্ এসে গেছে।

নামতে হবে এখানে।

আবার তীর্থের কাকের মত 'হা পিত্যেস' করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে প্রত্যাশিত গাড়ীখানির আশায়। আবার সেই যুদ্ধ আর কসরৎ! 'জান্' আর জামা-কাপড়, দুটো রক্ষা করা অসম্ভব।

বাবুলোক তো দূরের কথা, ছোটলোকেরাও আর এক ছটাক হাঁটতে রাজী নয়—চারটে ছ'টা পয়সা খরচ করলেই যদি পায়ের খরচটা কিছু বেঁচে যায়, কেন করবে না ? তা'র জন্যে যদি দু'চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ক্ষতি কি ? বরং মারামারি ঠেলাঠেলি লাঠালাঠি ফাটাফাটি সব করতে রাজী আছে, তবু দু'চার পা হেঁটে চলে যেতে রাজী নয়।

এটা যুদ্ধের বাজার, পয়সার চেয়ে মানুষ দামী।

দক্ষিণ কলিকাতাগামী একখানা ট্রামে উঠে বসলেন ডাক্তার।

দিদির বাড়ী একবার না গেলেই নয়, এতদিন পরে এসে দেখা না করে যাওয়াটা বিবেকেও বাধে, দিদিও শুনলে আস্ত রাখবেন না, তা ছাড়া—নতুন বইও একখানা প্রেজেণ্ট করতে হবে জামাইবাবুকে।

চিন্তার ধারা ঘুরে যায়।……

ভাবতে থাকেন নতুন বইখানার কথাই। ধনিক শ্রমিক সমস্যা, রাজনীতিক তর্কের কচকচি, আর 'বুর্জ্জোয়া' 'কমরেড' প্রভৃতি বাজার চলতি শব্দ বর্জ্জিত নেহাৎই হৃদয়-দ্বন্দ্বমূলক এই উপন্যাসখানি সমাজে আদর পাবে কি ? কে পড়ে এসব বই ? কার কাছে আছে সত্যিকার ভালো জিনিসের কদর ?…শেষ পর্য্যন্ত দুর্গতিই হবে না তো ? পূর্ব্বে প্রকাশিত বইগুলো অবশ্য চলছে, কিন্তু আশানুরূপ নয়।

সাহিত্যের আসরে হঠাৎ হৃদয়দ্বন্দ্বের হিসাবটা তুচ্ছ হয়ে বাইরের দ্বন্দ্বের হিসাবটাই এমন প্রবল হয়ে উঠলো কেন ? পাঠকের চাহিদা বুঝেই কি লিখতে হবে ? না লেখকের নিজের ভিতরকার তাগিদে ?…

আচ্ছা, নির্ম্মলা কি কোনো দিন পড়েছে "নীলজ্যোৎস্না", চিরাচরিত", "ক্ষণ বিদ্যুত" ? পড়লেই বা কি ? 'বিক্রমাদিত্য'কে কি সে চেনে ?…কখনো কখনো ইচ্ছে হয় আর একবার দেখতে…এই তো এবারেই দেখে

গেলে কি হয়? কোথায় আছে সে? বাইশ নম্বরের সেই বাড়ীটায় গেলেই দেখতে পাওয়া যায় কি?

লাভ লোকসানের কি আছে? সে নির্ম্মলা তো আর জেগে বসে নেই? বিধবা বঙ্গনারী! হয়তো গীতা ভাগবত গোবর গঙ্গাজলের সাহায্যে পরকালের পথ পরিষ্কার করছে বসে বসে।......

কিন্তু বেঁচেই যে আছে তার কি মানে? হাজার হাজার লোক মরছে প্রতিদিন, নির্ম্মলাও তো মরতে পারে? হয়তো দেখা করতে গিয়ে শুনবে নির্ম্মলা মারা গেছে।......কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাইনী বুড়ির মত জ্যেঠিটা কপাট খুলেই চোখে আঁচল দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠে বলবে—"আর কাকে দেখতে এসেছ বাবা? নির্ম্মলা আমাদের ফঁাকি দিয়ে চলে গেছে···তখন যদি তোমার হাতে দিতাম, তা হলে মা আমার আজ রাজরাণী হয়ে......"

হঠাৎ নিজের মনে হেসে ওঠেন মিহির গুপ্ত। নিজেরই একখানা উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদ যে এটা! স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি? নির্ম্মলা কে? মিহির গুপ্তর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?

কাছারি বাড়ীতেই বেশ কয়েকদিন কেটে গেল নিখিলের।

কল্যাণীকে খুঁজে বার করবার ভার নেবার সময় নিখিল বুঝতে পারেনি কাজটা এত দুরূহ। কোথায় খুঁজবে তাকে? কোন্ চিহ্ন ধরে? শৈলদির কাছে খবর পেয়েছিলো এক রাত্রি আশ্রমে থেকে কলকাতায় দাদার কাছে চলে গেছে। কিন্তু কি তার দাদার ঠিকানা? নাম কি? হারিয়ে যাওয়ার পক্ষে কলকাতার মত জায়গা আর কোথায় আছে? পাশের বাড়ীতে থাকলেও তো চিনে বার করবার উপায় নেই। তা ছাড়া যাকে চেনে না, তাকে চিনে বার করবার মন্ত্র কি?

তবু কলকাতায় যাওয়া দরকার, কিন্তু বাবাকে একলা ফেলে রেখে আর যেতে ইচ্ছে করে না তা'র। নিখিলকে কাছে পেলে যে কত তৃপ্তিতে থাকেন বিভূতিবাবু, এতো তার অজানা নয়। এই অঞ্চলেরই আশে পাশে অর্থহীনভাবে খুঁজে বেড়ায়।

বিভূতিবাবু নিজেই তুললেন কথাটা। উপাসনার শেষে ঘরে এসে বসেছেন, সদ্য নিদ্রা ভঙ্গের শিথিল আলস্য নিয়ে নিখিল উঠে এল। ছেলের সুকুমার অথচ বলিষ্ঠ গঠন ভঙ্গীর পানে স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন —তোদের কলেজ খুলতে আর কদিন আছে রে?

—এই তো কদিন, নভেম্বরের তেসরা খুলবে।

—তা'হলে এইবার কলকাতায় যাবার ঠিক কর, তা' ছাড়া ওই ভদ্র-মহিলাটিরও একলা যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে—

—তা' হয়তো হচ্ছে, কিন্তু উনি যে আবার এক বায়না ধরেছেন, মুখের ওপর 'না' বলতেও পারি না—

—কি বায়না আবার ?

বিরক্ত ভাব গোপন করেন না বিভূতিবাবু।

—বলছেন—কাজলাগড়ে যাবেন আমাদের বাড়ী দেখতে, তা'ছাড়া এখানে একদিন হিজলী জেল দেখতে যেতে চাইছিলেন।

—না।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে নিখিল প্রশ্ন করলে—আপনি কি এখন এখানেই থাকছেন ?

—ভাবছি একবার বেরোবো। মাঝে মাঝে তীর্থ যাত্রা না করলে মনটা বদ্ধ জলের মত পঙ্কিল হয়ে পড়ে।

অনেক রাত্রে পিছনের সেই বাগানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন বিভূতিবাবু। রাত্রে আহারের পর কিছুক্ষণ খোলা হাওয়ায় বেড়ানো তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। অন্যমনস্কতার অবসরে 'কিছুক্ষণ' যে কখন 'অনেকক্ষণে' গিয়ে ঠেকেছে তার হিসাব ছিল না।

চলতে চলতে একবার মুখ তুলে উপরকার ঘরের খোলা জানালার দিকে তাকালেন, মৃদু আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে জানলার পথে।—বাতি কমান আছে···নিখিল বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমানুষ! ······কল্যাণীও ছেলেমানুষ ছিল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ত না। অনেকদিন লক্ষ্য করেছেন বিভূতিবাবু, ঠিক ওইখানে জানলার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো অনেক রাত পর্য্যন্ত। চোখ মুখ শাড়ী জামা আলাদা করে কিছু বোঝা যেত না—শুধু দীর্ঘ একটি ছায়া।

অনেকক্ষণ বেড়িয়ে কেমন শ্রান্তি এসে যায়।

বসলে হ'ত।

বসবার উপযুক্ত যায়গার অভাব অবশ্য নেই। বকুল গাছের গোড়ায় মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো বড় বেদিটাই তো আছে বসবার জন্যে—যেখানে ভূপতি লাহিড়ী জ্যোৎস্নারাত্রে মল্লিকার 'গোড়ে' গলায় দিয়ে, কাণে আতরের তুলো গুঁজে, রূপোর গড়গড়া আর সোনার 'তাম্বূল করঙ্ক' নিয়ে বসে গানের গলা সাধতেন—আর বিভূতি লাহিড়ী যেখানে রাত্রিশেষের অখণ্ড নিস্তব্ধতায় বসে উপাসনা করেন।

বেদির কাছে গিয়ে বেশ নিঃশঙ্ক চিত্তেই বসতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়ল কে যেন শুয়ে আছে।···নারীমূর্ত্তি না?

মুহূর্ত্তের জন্য হৃৎপিণ্ডটা দুলে উঠেই স্থির হয়ে গেল। অসম্ভব সম্ভব হয় নাকি? না। সংসারটা বইয়ের গল্প নয়।

কিন্তু কে এখানে? সেই বেহায়া বাচাল মেয়েটা নিশ্চয়, নইলে দাসদাসীর পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার নেই এখানে।

—কে—কে এখানে?

উত্তর নেই।

—এখানে শুয়ে কে?

উত্তর নেই।

—উত্তর দাও···কে এখানে?

অস্ফুট একটা কাতরোক্তি—নিদ্রাভঙ্গের গৌরচন্দ্রিকা গোছের।

সহসা উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেন বিভূতিবাবু—নিখিল, জেগে আছো? টর্চ্চটা নিয়ে একবার বাগানে এসো তো?

নিদ্রাতুরের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল।

—এটা কি বাগান? আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম না কি? কি আশ্চর্য্য! কটা বেজেছে বলুন তো?

—বারোটা।

—কী সাংঘাতিক! মরে গিয়েছিলাম না কি? ভীষণ গরম হচ্ছিল—ঘরে টি'কতে না পেরে নেমে এসেছিলাম মনে পড়ছে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম কখন বলুন তো?

—বলা যাবে না, কারণ—ঘুমিয়ে পড়েননি।

উত্তর শুনে প্রশ্নকর্ত্রী একটু থম্‌কে যান।

একমিনিট স্তব্ধতা।

—আপনি বুঝি এখানে বসতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—বসুন না, চমৎকার হাওয়া ব ছে।

—যথেষ্ট রাত হয়েছে—বাড়ীর ভিতর যান আপনি, বাইরের লোক আপনাকে এখানে দেখলে সন্তুষ্ট হবে না।

ঈষৎ আদেশের সুর ধ্বনিত হ'ল কণ্ঠস্বরে।

—বাজে লোককে আমি কেয়ার করি না—বাড়ীর মধ্যে যা গরম! শীতকালে পর্য্যন্ত আমার ঘরে সারারাত পাখা চলে।

কথার সুরে বেপরোয়া অবজ্ঞার ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—সেই ঘরটা ছেড়ে আসাই ভুল হয়েছে আপনার। নিজের জায়গায় থাকলে কার্ত্তিকের হিমে গরমে ছট্‌ফট্‌ করতেন না!

—ঘরেও শান্তি নেই আমার বিভূতিবাবু!

করুণ সুরের সঙ্গে একটি বিলম্বিত দীর্ঘনিঃশ্বাস।...

একটা রাতচরা পাখীর তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ শনশন করে উঠলো গাছের মাথায়। কার্ত্তিকের নতুন হিম জানান দিচ্ছে, শিরশির করে উঠছে বুকের ভিতর।

—ওকি আপনি চলে যাচ্ছেন বুঝি? বা রে!

—আপনি না গেলে আমাকেই যেতে হবে বাধ্য হয়ে।

—উঃ কী সাংঘাতিক লোক আপনি! আমাকে এই অন্ধকারে সাপখোপের মুখে একলা ফেলে চলে যাবেন? যা সাপ আপনাদের দেশে! নিন্দে করছি বলে রাগ করবেন না—জায়গাটি কিন্তু সুন্দর, আর আপনার এই বাগান! মার্ভেলাস! বাস্তবিক রুচিজ্ঞান আছে আপনার।

—হ্যাঁ আছে। বাস্তবিকই আছে। সেই রুচিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি আপনাকে, দয়া করে এত বেশী পীড়ন করবেন না তার ওপর।

স্থির গম্ভীর কণ্ঠের শেষ রেশ মিলোবার আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শ্বেত পাথরে গড়া দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ বিভূতি লাহিড়ীর।

আর বলাকা দেবী?

বোধ করি সর্পবহুল দেশের একটা বিষাক্ত সর্পের তীব্র দংশনের প্রার্থনাই করতে লাগলেন বসে বসে।

সকাল বেলা।

নিখিলকে ডেকে বললেন বলাকা দেবী—প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে নিখিল, আজই কলকাতায় যাচ্ছি আমি।

বিস্মিত নিখিলের প্রশ্নসূচক দৃষ্টির উত্তরে মুচকি হেসে বলেন—আর ভালো লাগছে না, বেজায় মন কেমন করছে তোমাদের প্রফেসর সাহেবের জন্যে।

পরিহাসের ভঙ্গীতে লজ্জিত হলেও ভারী কৃতজ্ঞতা বোধ করে নিখিল।

আজ সকালেই বিভূতিবাবু ছেলেকে ডেকে আদেশ দিয়েছেন বলাকা দেবীকে বিদায় দিতে। এর আগে বাবাকে কখনো বিরক্ত হ'তে দেখেনি নিখিল।

অপ্রিয় কর্ত্তব্যটা করতে হ'ল না বলে মিসেস চ্যাটার্জ্জির উপর কৃতজ্ঞতার বশে বরং অতিমাত্রায় ভদ্র হয়ে ওঠে নিখিল। যা শুনলে ভালো

লাগা উচিত সেই মামুলী ভদ্রতার কথাই বলে—আপনাকে এনে শুধু কষ্ট দেওয়া হল। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন অসম্ভব অবস্থা পড়ে গেল আমাদের, আপনার খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত দেখে উঠতে পারিনি—যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করলেন এ ক'দিন।

বিলোল দৃষ্টি তুলে মিষ্টি একটু হাসলেন বলাকা দেবী।

—তার জন্যে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না—আবার হয় তো কোনদিন এসে উপস্থিত হবো তোমাদের জ্বালাতন করতে।...হাঁ ভালো কথা—ডাক্তার বাবুর ঠিকানাটা কি বল তো—একটা চিঠি দিতে বলেছিলেন ভদ্রলোক, কলকাতার কয়েকটা খবর দিয়ে।

—ঠিকানা? ডাক্তার মিহির গুপ্ত, মৃন্ময়ী সেবাশ্রম, ঈশ্বরপুর—বললেই চলে যাবে, কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজেই তো কয়েকদিন হ'ল কলকাতা গেছেন।

এমন কি খবর, যা জানবার জন্যে ডাক্তার গুপ্ত বলাকা দেবীর শরণাপন্ন হবেন? বুঝে উঠতে পারে না নিখিল।

যাবার সময় বিভূতিবাবুর ঘরের সামনে বিদায় নিতে এসে দুই হাত কপালে ঠেকানোর ভঙ্গীতে অর্দ্ধপথে রেখে মধুরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বলাকা দেবী—নমস্কার বিভূতিবাবু, অনেক জ্বালিয়ে গেলাম আপনাদের, নিষ্কণ্টক হলেন এবার, বিদায়!

প্রত্যুত্তরে বিভূতিবাবু শুধু দুই হাত তুলে নমস্কার করলেন।

গাড়ীতে ওঠবার পরমুহূর্ত্তেই কেষ্টার-মা ঝি মুখখানা বাঁকিয়ে স্বগতোক্তি করলো—দণ্ডবৎ তুমি করবে কেন মা, তোমারই ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ। খুব 'নীলে খেলাটা' দেখালে বটে, মনে থাকবে 'চেরকাল'।

আশা করেছিল—কলকেতার কেতাদুরস্ত মানুষ, দিলদরিয়া মেজাজ,

হাতও দরাজ হবে, যাত্রাকালে মোটা বখশিশ মিলবে। ক'দিন কি কম খাটুনী খাটিয়েছে তাকে মাগী? বলাকা দেবী হয়তো শুনলে মূর্চ্ছা যেতেন যে তাঁর সম্বন্ধে 'মাগী' নামক অশ্লীল অভব্য বিশেষণটি প্রয়োগ করতে কিছু-মাত্র দ্বিধা বোধ করল না কেষ্টার মা।

—ঘেন্নায় কোথা যাবো মা, এতদিন ধরে খেয়েমেখে চলে গেল, উপুড় হস্তটি করল না! কোন চুলো থেকে যে অপয়া মাগী এলো, ওকে দেখেই তো আমাদের সোনার পিত্তিমে বৌমা অভিমানে নিরুদ্দিশ হ'ল।

মুখে যতই 'মুখ সাপোর্ট' করুন, ভিতরে ভিতরে একটা সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালায় জর্জ্জরিত হচ্ছিলেন বলাকা দেবী। তাঁর এই চলে আসার মধ্যে যে তাড়িয়ে দেওয়ার আভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেটা আর কারো কাছে না হলেও তাঁর নিজের কাছে বিলক্ষণ ধরা পড়ছিল।

'অসভ্য চাষা' 'গেঁয়ো ভূত' 'পয়সা থাকলে কি হবে', 'মেদনিপুরী বৈ তো নয়'—বলে যতই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করুন নিজেকে, তবু সেই 'অপমানের মৌনদাহে চিত্ত দহে তুষানলে' গোছ ভাবটা রয়েই গেল। এমন কি নিখিলের সঙ্গেও ভালো করে কথা কইতে পারলেন না। একলাই আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিখিল রাজী হয়নি। আরো দু'চারদিন হয়তো থাকতে পারতো সে, কিন্তু প্রফেসরের কাছে একটা দায়িত্ব আছে তো তার?

বলাকার সমস্ত অপমান অবহেলার জ্বালা শীতল প্রলেপে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ষ্টেশনে এসে।

ষ্টেশনে বিরাম।

ব্যারিষ্টার বিরাম সেন, ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকছে।

উপযাচিকা হয়ে সম্ভাষণ করতে হল না, ব্যারিষ্টার নিজেই হৈ চৈ বাধিয়ে দিল।

—মাই গড্, স্বপ্ন দেখছি না তো? আপনি কোথা থেকে? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পার্চ্ছিনা এখনো, আপনি সত্যি তো—না ছায়া মূর্ত্তি?...আমি? আমাদের কথা ছেড়ে দিন...পৃথিবীর কোথায় না আমরা? এসেছিলাম একটা জরুরী কেসের তদন্ত করতে—আজ ফিরছি। আসুন উঠে পড়ুন, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বইলেন'—ট্রেনে মোটে ঘুম আসেনা আমার, অথচ সঙ্গের বই ফুরিয়ে গেছে। ভাবছিলাম—কি করি! ভগবান নিঃসঙ্গ অভাগার সঙ্গিনী জুটিয়ে দিলেন।...ও ভদ্রলোকটি কে? আপনার বাহন নাকি? আশা করি আমাদের কামরায় উঠে রসভঙ্গ করবেন না?

রসভঙ্গের আশঙ্কায় বলাকা দেবীকে নিজের কামরায় তুলে নিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেন ব্যারিষ্টার সাহেব।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডগমগ ব্যারিষ্টার সাহেবের পার্শ্বলীনা বলাকা দেবী নিখিলের দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে এই কথা ক'টি ছুঁড়ে দিলেন...

—আচ্ছা হাওড়ায় দেখা হবে আবার, পাশের গাড়ীতে আছো তো? আমার মালপত্রগুলো দেখো।

আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল নিখিল, হঠাৎ যেন একেবারে গৌণ হয়ে গেল বেচারা।

গুছিয়ে গাছিয়ে বসে আরামে আর আনন্দে বিগলিত বলাকা দেবী উচ্ছল কণ্ঠে বলে ওঠেন—একলা যে? বৌ কোথায়—

—বৌ? কি মুস্কিল, বৌকে কি আমি পকেটে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি?

কেন একলা ভয় করছে নাকি আপনার? ভয় নেই, সাদা চোখে আছি এখনো। সিম্প্‌লি একটা সিগার—আশা করি আপত্তি নেই? মাথা ধরে উঠবে না তো? আমার শ্রীমতীটি তো সিগার ধরালেই সরে বসেন।

হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল বিরাম সেনের আলো-পিছ্‌লে-পড়া সম্ভ্রান্ত চেহারার সিডানখানা। ব্যারিষ্টার অধ্যাপক-জায়ার হাত ধরে তুলে দেয়। বোধ করি সামান্য ইতস্ততঃ করছিলেন বলাকা দেবী নিখিলের প্রত্যাশায়—এক ফুৎকারে সমস্ত দ্বিধা দূর করে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ে বিরাম বললে—তার জন্যে ভাববার কি আছে? দুগ্ধপোষ্য শিশু তো নয়, নিজের সদ্‌গতি করে নেবে।···আশা করি রাগ করেননি আমার ওপর?

—না রাগের কি আছে?

বলাকা দেবীর ফুল্ল স্বরটা একটু স্তিমিত শোনালো।

—মনে হচ্ছে যেন চটেছেন। আচ্ছা সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি গতরাত্রের বাচালতার জন্যে, হাতটা জোড়া না থাকলে করজোড়ে ভিক্ষা করতাম।

গাড়ীর গতিটা আর একটু বাড়িয়ে দেয় বিরাম।

প্রফেসর প্রস্তুত ছিলেন না, স্ত্রীর এরকম আকস্মিক আবির্ভাবে একটু উল্লসিত না হয়ে পারলেন না।

—এসে পড়েছ? বেশ বেশ, আমিও ভাবছিলাম—শীত পড়ে গেছে, পাড়াগাঁয়ের ঠাণ্ডা সহ্য হবে কিনা তোমার—

—ছাই ভাবছিলে—আমার জন্যে তো তোমার ভাবনার শেষ নেই, বরং ভাবছিলে বাঁচা গেছে আপদের শাস্তি হয়েছে—

কাজলপরা কালো চোখ ছলছল করে আসে। সত্যি, দেখলে মায়া না করে উপায় নেই।

প্রফেসর সস্নেহে কাছে টেনে একটু আদর করে বললেন—বদ্ধ পাগল!

—পাগলই তো, নইলে তোমার মতন নির্মায়িক লোকের জন্যে মন কেমন করে? জোর করেই নয় চলে গিয়েছিলাম—আসতে বলতে নেই বুঝি?

—বাঃ তোমার বাড়ীতে তুমি আসবে তার আবার বলবো কি?

—হ্যাঁ বলবে, কেন বলবে না? আমার বুঝি ইচ্ছে করেনা কেউ আমার বিরহে দিনরাত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলুক—আমার আশাপথ চেয়ে দিন গুণুক!

এত কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা প্রফেসরের নেই। চকচকে টাকে একটি হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—সেতো বটেই, সেতো বটেই, আমিও তো ভাবি—তোমার ইচ্ছে মত চলবো, কি যে হয় সব গুলিয়ে যায়।

—মামীর রণমূর্ত্তি দেখলে তো তোমার মাথাটাই গুলিয়ে যায় মামা!

চায়ের পেয়ালা হাতে করে সহাস্য মুখে নির্ম্মলা ঘরে ঢোকে। ট্রেন থেকে নেমেই এক পেয়ালা চা না হ'লে যে মামীর মেজাজ সপ্তমে উঠবে, এতো তার অজানা নেই।

পরিহাসটুকু করতে সাহস করলো—নেহাৎ অনেকদিনের অদর্শনের ভরসায়। এসেই কি আর মেজাজ দেখাবে ?

কথার শেষাংশটুকুই শুনেছে—না আরো কিছু শুনেছে এই ভেবে লজ্জিত হয়ে পড়েন প্রফেসর। আর বিরক্ত হন বলাকা দেবী…এই জন্মেই তো দু'চক্ষে দেখতে পারেন না ওকে। মামার সোহাগে ডগমগ একেবারে ! কেনরে বাপু, বিধবা আছিস বিধবার মত একপাশে পড়ে থাক্, তা নয় সর্ব্বত্র থাকা চাই। কোন চুলোয় যে ছিলেন আগে, বিধবা হয়ে কেঁদে এসে পড়বার আর জায়গা পেলেন না !…নির্ম্মলা আশ্রিতা, নির্ম্মলা দুঃখীনি বিধবা মাত্র, তবু নির্ম্মলার হিংসেয় মন বিষ হয়ে ওঠে। অথচ এই প্রায় সমবয়সী মেয়েটাকে অবজ্ঞা করা ছাড়া শাস্তি দেবার আর কিছু খুঁজে পান না। তাড়াবার কথা তুললে যে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপটুকুও ঘুচবে, তাও তো জানতে বাকী নেই।

কাজেই—কুশলপ্রশ্ন মাত্র না করে গম্ভীর মুখে চায়ের পেয়ালাটি তুলে নেন।

কোর্ট থেকে ফিরেই সুরেশবাবু প্রবলকণ্ঠে ডাক দিলেন—মণি। কইরে মণি, নীচে আয় শিগ্‌গির।

—যাই বাবা—বলে দুড় দুড় করে নীচে নেমে এসে মণি থমকে দাঁড়িয়ে গেল, বাবা একা নন, পিছনে একটী ভদ্রমহিলা। আন্দাজ করলে তারই শিক্ষয়িত্রী।

অবশ্য বেশিক্ষণ সন্দেহের দোলায় দুলতে হ'ল না। সুরেশবাবুর উদাত্ত স্বর গমগম করে উঠলো—এই নিয়ে এলাম তোমার জন্যে, যতো পারো পড়ো এঁর কাছে, আর জ্বালাতন কোরতে এসোনা আমায় 'অঙ্ক বুঝিয়ে দাও' বলে—বুঝলে তো? খুব ভালো মেয়ে ইনি, যত্ন করে দেখাশোনা করবেন তোমাকে। রেজাল্ট ভালো হওয়া চাই কিন্তু।

কিছুদিন ধরে একজন প্রাইভেট টিউটর রাখার কথা হচ্ছিল, কিন্তু তরুবালার 'দাদাবাবু'তে ভীষণ আপত্তি, 'দিদিমণি' না হলেই নয়। এতদিনে এই দিদিমণিটিকে সংগ্রহ করে এনেছেন সুরেশবাবু।

—এই রইল আপনার ছাত্রী, আর রইলেন আপনি, এখন করুন বোঝাপড়া, টেষ্ট তো এসে গেল।

এতক্ষণে ভেবেচিন্তে ছোট্ট একটি নমস্কার করলো মণি। খুব লজ্জা করলেও ভারী ভালো লেগেছে তার ভদ্রমহিলাটিকে। বয়স নেহাৎই কম, পাতলা লম্বা গড়ন, শ্যামল রং হ'লেও মুখশ্রী চমৎকার, আর চমৎকার প্রশস্ত উজ্জ্বল চোখ দু'টি।

—আপনাকে কি বলে ডাকবো আমি?

—কি বলে? সুকল্যাণীদি বলতে পারো।...

এটুকু গোপনতার প্রয়োজন কি ছিল? একটু ছদ্মনামের আড়াল?
সামান্য ইতস্ততঃ করে বললে—তোমার নাম কি?

—আমার নাম মণি।

—শুধু 'মণি' বলছিস যে বড়?...দিদির নাম 'তর্কচূড়ামণি' বুঝলেন?
মল্লিনাথকে দেখা গেল না কিন্তু, চাঁচাছোলা গলাটি স্পষ্ট শোনা গেল।

বাইরের লোক বা নতুন লোকের কাছে দিদিকে একটু অপদস্থ করবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারে না সে—যতই ভালোবাসুক দিদিকে।

কল্যাণীরও ভারী ভালো লেগে গেছে এই দুষ্টু চঞ্চল কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে দুটিকে। নিজের মনমরা মন যেন ওদের প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরে ওঠে। পড়াবার কথা একলা মণিকে, কল্যাণী দুজনকেই পড়ায়। আসবার কথা সপ্তাহে তিনদিন, কল্যাণী প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলাই এসে হাজির হয়।

বেশীর ভাগই একতলায় পড়ার ঘরে মল্লি বসে থাকে, কল্যাণীর সাড়া পেলেই তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের 'দিদি' ডাক হুইশ্লের মত বেজে ওঠে। মণি ছুটে আসে বইপত্তর নিয়ে—বসে একটু হাঁফিয়ে নেয়, তবে পড়া আরম্ভ করে।

কল্যাণী রোজই অনুযোগ করে—আচ্ছা এত ছুটে আসো কেন বলো তো? আমি তো এসেই পালিয়ে যাচ্ছিনা?

—ছুটিনি তো, এমনি এলাম—বলে মণি মুখের ঘাম মোছে।...হয়তো মায়ের কাজের সাহায্য করছিল রান্না-ভাঁড়ার ঘরে। নয়তো পালিয়ে গিয়ে ছাদে বেড়াচ্ছিল একটু।

ওরা পড়ে। মাঝে মাঝে তরুবালা এসে উঁকি দিয়ে যান দেখতে—অবান্তর কথা হচ্ছে, না দস্তুরমত অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলছে? একজনের

বদলে দু'জনকে পড়ালে বা তিনদিনের জায়গায় সাতদিন পড়ালে আপত্তি করবেন এমন সঙ্কীর্ণচিত্ত মেয়েমানুষ তরুবালা নন, তবে পড়ানোতে ফাঁকী দেওয়াটা তো সত্যি বরদাস্ত করা যায় না।...

না, অভিযোগযোগ্য কিছু নেই, মেয়েটা সত্যিই ভালো। সন্ধ্যাবেলা নিজের মেয়েটাকে একটা কাজে আট্কা দেখে তাঁর ভারী স্বস্তি হয়, বিকেল হলেই কি যে উন্মনা হয়ে বেড়াতো।

আজকাল যেন মেয়ের মনটা একটু বসেছে।

বসেছে সত্যিই। পড়া নেওয়া দেওয়া, তৈরি করে রাখা এবং ঘাড়ের উপর এসে পড়া পরীক্ষার চাপে মাথা তুলবার সময়ও পাচ্ছে না বেচারা, তবু...প্রথম শীতের মৃদু হিমেল হাওয়ায় যখন সর্ব্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে, ভয় ভয় করে বুকের ভিতরটা, অবশ আঙ্গুলের ডগা থেকে খসে পড়তে চায় পেন্সিলটা, পড়তে পড়তে আনমনা হয়ে যায়।...তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে কুয়াসাচ্ছন্ন ম্লান আকাশের দিকে, ম্লান হয়ে আসে মনটা। অনিচ্ছুক মনকে টেনে এনে বসাতে চায় নীরস পাঠ্যপুস্তকে, বারে বারে ভুল হয়।

আজও সন্ধ্যাবেলা—কিছুক্ষণ ধরে ওর এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে কল্যাণী মৃদু হেসে প্রশ্ন করলে—

—তোমার কি হয়েছে আজ, শরীর ভাল নেই?

—শরীর ভালো আছে তো।

রক্তিম মুখে বইটা আরো কাছে টেনে নেয় মণি।

—থাক না হয় আজ, যদি খারাপ লাগে সে পড়া মাথায় ঢুকবে না।

—মাথায় আর ছাই ঢোকে—মল্লিনাথ টিপ্পনি কেটে ওঠে হঠাৎ—মাথার মধ্যে তো খালি নিখিলবাবুর চিঠির ভাবনা! হুঁঃ।

বিস্মিত কল্যাণী মণির প্রায় টেবিলের সঙ্গে ঠেকে যাওয়া নত মুখের পানে তাকিয়ে বলে—নিখিলবাবু কে?

—দিদির বন্ধু। অবশ্য আমারও বন্ধু, তবে আমাকে তো আর চিঠি দেন না যে দিনরাত উত্তুর ভাববো ?···দিদি—আঃ চিমৃটি কাটছিস যে—

কিছুদিন ধরে কল্যাণীকে দেখে এটুকু বোধ জন্মেছে যে মার মতন ভয়াবহ লোক নয়, কাজেই দিদিকে অপদস্থ করবার এই লোভটুকু সংবরণ করা তার পক্ষে দুরূহ হলো।

নিখিল নামটা যেন বড় পরিচিত, কল্যাণীও লোভ সামলাতে পারে না আর একটু প্রশ্ন করবার। স্বভাববহির্ভূত কৌতূহলের স্বরে বলে—তোমাকে চিঠি দেন না ? তবে তো বড্ডই বন্ধু তোমার! কিন্তু থাকেন কোথায় তিনি ?

—থাকেন তো হ্যারিসন রোডে—এখন যে দেশে গেছেন ছাই···ও কি—উঃ—আবার চিমৃটি কাটছিস্ দিদি ? বললে কি হয়েছে কি ? সেই মিদ্‌নাপুরের কোন খানে যেন ঈশ্বরপুরে ওঁর বাবার তৈরি একটা আশ্রম আছে সেইখানে গেছেন। দুটো চিঠি দিয়ে ব্যস্ আর উচ্চবাচ্য নেই। কে দিতে বলেছিল ? না দিলেই হ'ত, কি বলুন সুকল্যাণীদি ? শুধু শুধু মানুষের কষ্ট বাড়ানো ছাড়া কিছু নয় তো ? সত্যি কিনা বলুন—

কিন্তু কল্যাণীই বা কি বলে ? তারও যে প্রায় ছাত্রীর মতই অবস্থা। তবু অনেক কষ্টে সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—নিশ্চয় তো। চিঠি নিয়মিত লেখা উচিত বইকি, নইলে ভাবনা হবে যে মানুষের!···আরে আরে ওকি কান্না কেন ?

আর কেন! চড়া সুরে বাঁধা যন্ত্র সামান্য আঘাতেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠবে না ?

অপ্রতিভ মল্লি হঠাৎ চেয়ার টেবিল উল্টে ছুটে পালিয়ে যায়। নিজের অপরাধের গুরুত্বটা যেন হঠাৎ চোখে পড়ে গেছে।

পর দিন। মল্লিনাথের কি যেন একটা আশঙ্কা ছিল, সুকল্যাণীদি হয়তো আর আসবেন না। দিদির কাছেও ভালো করে সপ্রতিভ হয়ে কথা বলতে পারেনি সারাদিন। কিন্তু যেই দেখলে অন্য দিনের চেয়ে আগেই সুকল্যাণীদি এসে হাজির, সমস্ত অপরাধী ভাব ত্যাগ করে চীৎকার করে উঠলো—দিদি!

লজ্জিত মণি আজ আস্তে আস্তে এলো।

কতই বা বয়সের তফাৎ, তবু ওর এই লজ্জিত ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বাৎসল্য স্নেহের মত একটা মিষ্ট স্নেহে মন ভরে ওঠে কল্যাণীর। মণির পিঠের উপর একটা হাত দিয়ে কোমল স্বরে বলে—মন খারাপ করছিস্ কেন রে মণি? ফূর্ত্তি করে না পড়লে পরীক্ষা খারাপ হবে যে!

মল্লিনাথ আজ আর কথাবার্ত্তা বলে না, গম্ভীর হয়ে বই খুলে বসে।

—আমি একবার ঈশ্বরপুরে গিয়েছিলাম—

কল্যাণীর আচম্‌কা কথা শুনে পড়তে পড়তে চমকে ওঠে মণি।

—তা'হলে তো নিখিলবাবুদের আশ্রমও দেখেছেন?

মল্লির প্রশ্নে কল্যাণী দ্বিধায় পড়ে যায়। এই সরল বালকটির সামনে মিথ্যা কথা বলাও শক্ত, আবার সত্য বলাই উচিত কিনা কে জানে! হঠাৎ কেন ব্যক্ত করে ফেললো কল্যাণী নিজের অন্তরের অন্তর্নিহিত খবরটি?

বলবে বলেই কি বলেছিলো?

নিখিলকে সে দেখেনি তবু নিখিলের নামের সঙ্গে এই নব কিশলয়ের মত কিশোরীটিকে যুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল চিন্তার রাশ।···কোথা থেকে কোথায় যায় সেই অলস চিন্তার গতি···অন্যের সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে কখন এসে সমস্ত চিন্তা অধিকার করে বসে নিজের সমস্যা।

মল্লি যখন প্রত্যাশিত আগ্রহে উৎফুল্ল মুখে প্রশ্ন করে—বলুন না সুকল্যাণীদি, দেখেছেন আপনি নিখিলবাবুদের আশ্রম ?···কি নাম রে দিদি ?

—"মৃণ্ময়ী সেবাশ্রম"। নিখিলবাবুর মার নামে তৈরি।

—দেখেছি বৈকি, সেখানেই ছিলাম যে আমি।

—আশ্রমেই ছিলেন ? কী কাণ্ড !···ও দিদি, সুকল্যাণীদি সেখানেই ছিলেন—কী মজা !···আপনি তা'হলে নিখিলবাবুকেও দেখেছেন ?

—না উনি তখন যাননি।

—সেখানকার গল্প করুন না সুকল্যাণীদি, শিখে নিয়ে এরপর তাক লাগিয়ে দেব নিখিলবাবুকে।

—আচ্ছা বলবো—কিন্তু তোমাদের নিখিলবাবুর কাছে যেন আমার নাম কোরো না বুঝলে ? তা' হলে কিন্তু রাগ করে চলে যাবো আমি !

—উঁহু তা' করবো কেন ? সব মজাই নষ্ট হয়ে যাবে যে তা'তে। রাগ করে চলে যাবেন বই কি, গেলেই হ'ল ? আচ্ছা নিখিলবাবুর সেই শৈলদিকে দেখেছেন ?

—নিশ্চয়।

—আর ওঁর বাবাকেও দেখেছেন নিশ্চয়ই ?

—কই ? নাঃ।

—বাঃ। আসল লোককেই দেখলেন না ? আমি হ'লে তো··· ওকি কে ? আরে ব্যস, অনেকদিন বাঁচবেন আপনি।···দিদি চুপ করে আছিস যে, নিখিলবাবু এসেছেন।

হঠাৎ উধাও হয়ে যায় মল্লি। বোধ হয় মাকে খবরটা জানাবার উদ্দেশ্যে।

নতনয়না ছুটি মেয়ের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল বোকার মত।

পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে চিঠিখানা পকেট থেকে বার করলেন মিহির ডাক্তার। বলাকা দেবীর চিঠি, রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছে ঈশ্বরপুর থেকে। চিঠি খুলে প্রেরকের ঠিকানা দেখেই একচোট হেসে নিলেন ডাক্তার। যে বন্ধুর বাড়ী এসে উঠেছেন, তারই কয়েকখানা বাড়ীর পরের নম্বর।

ধরা ছোঁওয়া যায় না এমন ভাষায় ইনিয়ে বিনিয়ে যে নিরামিষ প্রেমপত্র-খানি লিখেছেন ভদ্রমহিলা, সেখানি আগাগোড়া পড়বার ধৈর্য্য ডাক্তারের মত ব্যস্তবাগীশ লোকের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। ভাবলেন একবার দেখা করে এলে হয়, খুসী হয়ে যাবেন চ্যাটার্জ্জি গিন্নি।...

নাকি কর্ত্তা লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করবেন? বলা যায় না—পতিব্রতা পত্নীর প্রেমপত্তরের টানে ছুটে আসা বন্ধুকে ঠিক বন্ধুভাবে না দেখতেও পারেন। আপন মনে হেসে ওঠেন ডাক্তার।...

মিসেসকে না হোক মিষ্টারটিকে একবার দেখলে মন্দ হ'ত না, কি ত্রুটী আছে লোকটার? কিসের অভাবে বলাকা দেবী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছেন?

কয়েক দিনের জন্য এসে কেন যে মাসখানেক ধরে কলকাতায় আটকে আছেন ডাক্তার কে জানে। নিজেই জানেন কিনা সন্দেহ। দিদি ভয় পেয়ে বলেন—কিরে তোর চাকরীটা আছে তো? ভগ্নীপতি সহাস্য প্রশ্ন করেন—বৃদ্ধবয়সে কোনো "প্রলয়কাণ্ডে"র নায়ক হয়ে বসোনি তো ডাক্তার? এখানে যে 'চিটেগুড়ে'র মত আটকে গেলে দেখছি? বন্ধুরা মাঝে মাঝে ভালো চাকরীর সন্ধান দিচ্ছে—মিহির গুপ্তর মত দামী ছেলেটা একটা অনাথাশ্রমে পড়ে থেকে জীবন মাটি করবে এই বা কি কথা?

সত্যি, লোভও হয়। এই কলকাতা, যুদ্ধের খেসারৎ যোগাতে যোগাতে যতই শ্রীহীন সম্পদহীন হয়ে থাকুক তবু চিত্তাকর্ষক, তবু এর আকাশে বাতাসে তীব্র মাদকতা!

ধুলো ধোঁয়া আর জনতার চাপে লোকে ছট্‌ফট্‌ করবে, খুঁৎ খুঁৎ করবে, 'গেলাম গেলাম' করবে, তবু যাবে না। এক পা নড়বে না—একবার যে আস্বাদ পেয়েছে এই নির্জ্জলা মদের। একে ছেড়ে, এর সমস্ত সুখ সুবিধা ছেড়ে কি করে প্রবাসী হয়ে গেছেন তাই ভেবে হঠাৎ ভারী আশ্চর্য্য ঠেকে ডাক্তারের।...

চোখের বাইরে চলে গেলেই কি আকর্ষণের তীব্রতা কমে যায়?

যায় বৈ কি!

সেবাশ্রমের নীচু বাংলোয় কবার মনে পড়তো নির্ম্মলাকে? কবার ইচ্ছে করতো দেখতে?

অথচ এখানে এসে এ কী পাগলামীর ভূত ঘাড়ে চেপেছে! বাইশ নম্বরের বাড়ীখানায় মাদ্রাজি ভাড়াটে বাস করছে দেখেও বারে বারে সেই পাড়ায় 'চক্কর' দিয়ে আসতে ইচ্ছে করে কেন? পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোথায় এতটুকু আশ্রয় মিলেছে তা'র, সে কথা জানতে ইচ্ছা হয় কেন? এতদিন ধরে মিহির গুপ্তকে মনে রাখবার শ্রমটুকু স্বীকার করে নিয়েছে কিনা জেনে লাভ কি?...

তবু জানতে ইচ্ছা হয়।

সেই অদৃশ্য ইচ্ছার শিকলে বাঁধা পড়ে আছেন ডাক্তার।...

হরিহর, অমূল্য, পঞ্চুর মা—কে তারা? 'ছায়াছবির' মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে তারাই না? "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমের" সেই মেটে বাংলোয় মিহির গুপ্তকে ভুলিয়েছিল কি করে এতদিন?...

বসে থাকতে থাকতে ইচ্ছে হ'ল ঘুরেই আসি একবার বলাকা দেবীর বাড়ী। কি আর বলবে প্রফেসর? কতই বা বলতে পারবে? তাঁকে কেউ অপ্রতিভ করে ফেলতে পারবে এ আশঙ্কা অবশ্য নেই।

—ব্যাপার কি ? ডাক্তারবাবু যে—কলকাতায় রয়েছেন না কি ?

—কি মনে হচ্ছে ? নেই ?

—নাঃ নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি করে ? বসুন বসুন। হঠাৎ মনে পড়লো যে ?

—মনে না পড়িয়ে ছাড়লেন কই ? কিন্তু গৃহকর্ত্তা কই ? সেই নমস্য ব্যক্তিটি ? তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেই এলাম যে—

—আর আমরা বুঝি 'ফাউ' ?

—আপনারা তো চিরদিন-ই 'ফাউ', 'মিসেস্' না জুড়লে পরিচয় হয় না আপনাদের। তাছাড়া তিনি এসব অনধিকার প্রবেশ পছন্দ করেন কিনা না জেনে বসি কি করে ?

—অনধিকার প্রবেশ কিসে ? আমার বন্ধু আমার বাড়ীতে আসতে পারে না ?

—অবশ্যই পারে, যদি 'আপনার' বাড়ী হয়। কিন্তু এটা হ'ল আপনাদের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতার যুগ। অপরের উপার্জ্জিত সম্পত্তিকে নিজের বলে গ্রহণ নাও করতে পারেন।

—তা' বলে নিজের স্বামীর উপার্জ্জনও না ?

বলাকা দেবী হেসে ফেলেন।

—আসুন নেমে। স্বামী বলে স্বীকার করলে তো কোন গোলই নেই, কিন্তু করছেন কই ? 'স্বামী' শব্দটাই যে আপনাদের 'অরুচিকর'। কিন্তু তিনি আপনার স্বাধিকার বোধের ওপর একবিন্দু হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না—আর আপনি তাঁর সমস্ত কিছুতে হস্তক্ষেপ—শুধু ক্ষেপ্ নয়, একেবারে হস্তগত করে বসে থাকবেন এটা যে দস্তুরমত জুলুমবাজী! ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যই যদি কাম্য হয়—বেশ থাকুন মেস বাড়ীর দুই 'রুম-মেটের' মত ? কারুর ওপর কারুর কোনো দাবী দাওয়া থাকবে না। বন্ধনও থাকবে না কিছু। কেউ কারো ইচ্ছের উপর হস্তক্ষেপ করবে না—কেউ কাউকে চোখ রাঙাবে না—

—'ঘর সংসার' কথাটার তো কোনো অর্থই থাকে না তাহলে, ডাক্তার গুপ্ত !

—'ঘর সংসার' ?···হা হা করে হেসে ওঠেন ডাক্তার।—কথাটার সত্যিই কোনো অর্থ আছে না কি আপনাদের কাছে ? একপেয়ালা চায়ের জন্যে যাদের চাকর খানসামার দ্বারস্থ হ'তে হয়, একবেলা হাঁড়ির ভার নিতে হ'লে যাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, তাঁদের আবার ঘর সংসার কি ? রাগ করবেন না, শুধু আপনাকে বলছি না, বলছি অনেককেই। ঘর আপনাদের কোথায় ? ঘর ভেঙে আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু পথ চলবার পাথেয় নেই। অপর দেশের উদাহরণ দেখে ফ্যাসানের হাওয়ায় ভেসে যাওয়াই তো স্বাধীনতা নয় ?

—তা'হলে আপনার মত কি ? প্রত্যেকে নিজের নিজের জীবিকার সংস্থান করবে ? স্বামী-স্ত্রীর আলাদা ক্যাস্, আলাদা হিসেবের খাতা ?

—একশোবার—যদি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে সত্যিই কিছু মানেন। কিন্তু এটা না মেনে উপায় নেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি। তা নইলে অন্নবস্ত্রের জন্যে যদি কারুর দরজায় হাত পাততে হয়—কিছুটা বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে তার কাছে। কেন নয় ? দাতা তা'র নিজের উদারতায় যদিই বা সে গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে—গ্রহীতা করবে কোন মুখে ? 'সমান সমান' কোনদিনই হবে না, সমান অসমানই থেকে যাবে।

—আশ্চর্য্য মানুষ আপনি ডাক্তারবাবু ! শুধু অন্নবস্ত্রের মোটা হিসেবটাই

আপনার চোখে পড়ল? বন্ধনটা কিছুই নয়? স্বামী কি স্ত্রীর কাছে কিছুই পায় না?

—পায় বৈকি মিসেস চ্যাটার্জ্জি! যদি না পেত, তা'হলে বিবাহ প্রথাটাই কবে উঠে যেত যে! যুগযুগান্তর ধরে কেবলমাত্র একপক্ষের উদারতার জোরে একটা লোকসানের ব্যবসা টিঁকে থাকতে পারে না।··· পুরুষ পায় ঘর। কিন্তু সেই ঘর ভেঙে ফেলবার জন্যে আপনারা আজ উঠে পড়ে লেগেছেন, তাই না এত সমস্যা, এত তর্ক, এত আফশোষ!

—কিন্তু যুগযুগান্তর ধরে একটা জাত আর একটা জাতের অধীনতা মেনে চলতে থাকবে, এটাই কি ন্যায়-ধর্ম্মের কথা?

—অধীনতা ভেবেই বা এত কষ্ট পান কেন? 'অন্ন-বস্ত্রের মোটা হিসেবে' তো আপনাদের আপত্তি, ভালবাসার বন্ধনের দোহাই দেন, এক্ষেত্রেই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? শিশুও তো বয়স্কদের অধীন থাকে, সেটা কি অপমান? শক্তি সামর্থ্যে, বুদ্ধি বিবেচনায়, মেয়েরা যে আমাদের চেয়ে অনেক খাটো, সে কথা অস্বীকার করতে পারেন?

বলাকা দেবী ক্রমশঃই যেন কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন—তর্ক দু' চক্ষের বিষ তাঁর। দুটো সরস পরিহাস, দুটো মুখরোচক আলোচনা, ফ্যাসানের খাতিরে দুটো লাগসই কথাবার্ত্তা—এই পর্য্যন্তই ভাল লাগে। তার ওপরে উঠলেই যে দস্তুরমত বিপদ!···এই দোষ লোকটার, তর্কটা সিরিয়স না করে ছাড়বে না। লেখক কিনা, কথা জোগাতে দেরী হয় না! অথচ কিসের এত আকর্ষণ আছে ওর মধ্যে কে জানে। ওর সঙ্গে কথা চালাতে রীতিমত পরিশ্রম বোধ হলেও বিরক্ত হবার উপায় নেই।···ভেবে চিন্তে বলেন—শক্তি সামর্থ্যে কম হতে পারে—ভগবানের মার, কিন্তু বুদ্ধি বিদ্যায় কম এ স্বীকার করবো কেন?

—কম না হ'লে সাদা কথা বুঝতে এত সময় লাগে ?

ডাক্তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উচ্চহাস্য করে ওঠেন।

—আচ্ছা বেশ কমই—বলাকা দেবী হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—এতদিন পরে দেখা হ'ল কি তর্ক করে সময় নষ্ট করতে ?

—আমার তো মনে হয় সময়ের সার্থকতা এর চেয়ে বেশী কোনো কিছুতেই হয় না। তর্ক করার কি একটা উপকারিতা নেই ?

—উপকারিতা আছে বৈকি, শেষ পর্য্যন্ত ঝগড়া!

—ওটা বোকাদের পক্ষে। তর্কে হেরে গিয়ে যারা রেগে ঝগড়া বাধায়, তারা তো একের নম্বর বোকা। উপকারিতা—ভোঁতা বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ শান পড়ানো—যেটা বিশেষ দরকার আপনার পক্ষে।—বলে আরো একবার রীতিমত হেসে ওঠেন ডাক্তার।

এই হাসিই 'কাল' করেছে, রীতিমত চটে ওঠবার মত কথাতে চটে ওঠার জো নেই।

—তার মানে পাকে-প্রকারে আমায় বোকা বললেন ?

—ওই তো—'পাকে-প্রকারে' কোথা ? স্পষ্টই বলছি তো—বোকা না হ'লে এতক্ষণ অতিথির জন্যে এক পেয়ালা চায়ের হুকুম করেন না ? দেখছেন না ব'কে ব'কে গলা শুকিয়ে গেছে ?

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার এই এক চমৎকার কৌশল ডাক্তারের। কোনো সময় কোনো আলোচনাকেই তিক্ত করে তুলবেন না তিনি। তা ছাড়া—তর্ক করার কোনো মানে আছে নাকি এই রকম ভোঁতা বুদ্ধি আর নীরেট মগজওয়ালা মানুষের সঙ্গে ? মাঝে মাঝে এক আধটা চমক লাগাবার মত কথা বলে ফেলে—কিন্তু পরক্ষণেই ধরা পড়ে বুদ্ধির ফাঁকি।··· এর চেয়ে—ডাক্তার মনে মনে বলেন—পঞ্চুর মা—মাণিকের মাসির সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে। ওদের বোকামীটাও উপভোগ্য। কারণ সেটা

নির্ভেজাল। চমক লাগাবার দুরূহ চেষ্টা নেই বলেই মাঝে মাঝে ওদের মধ্যেও সহজ বুদ্ধির বিকাশ দেখলে চমক লাগে।

বলাকা দেবী উঠে গিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে 'বয় বয়' শব্দে পাড়া সচকিত করে চায়ের অর্ডার দিয়ে দ্বিতীয় আদেশ দেন—"যাও আভি সাহাবকো সেলাম দেও।"

'বয়' অর্থাৎ চাকর শ্রীপতি নিতান্তই বাঙালী। তার উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো 'সাহাবকো সেলাম' দিয়েছে কিনা সন্দেহ। দিতে শিখেছে—এ বাড়ীতে কাজে লেগেই।...নেহাৎ হাসি পেলেও—ডাক শুনলেই 'জী হুজুর' বলে আভূমি সেলাম করতে বাধ্য হয়। নইলে চাকরী বজায় রাখা কঠিন হ'ত।

আদেশ পেয়ে "জী হুজুর" বলে চলে গেল...এবং মিনিট কতক পরেই—আদেশ পালনের প্রমাণ স্বরূপ খদ্দরের পাঞ্জাবীটা মাথায় গলাতে গলাতে ও চটিজুতা ফট্‌ফট্ করতে করতে রঙ্গমঞ্চে 'সাহাবে'র প্রবেশ।

বলাকা দেবীর বন্ধু সম্মেলনের মাঝখানে স্বামীকে আমন্ত্রণ করে আনাটা নিতান্তই চক্ষুলজ্জার দায়ে। বাড়ীতে উপস্থিত না থাকলেই বাঁচতেন।...কিন্তু কে জানতো যে খাল কেটে কুমীর আনছেন?

প্রফেসরের সঙ্গে ডাক্তারের এমন জমে গেল যে বলাকা দেবী আর কল্কে পান না! বেচারা!

কি দুঃখে যে পুরুষমানুষরা এই সব বাজে বাজে নীরস তত্ত্ব আলোচনা করে? শুধু করে? মেতে ওঠে একেবারে।...শাসন তন্ত্রের কোথায় কি অনাচার আছে, রণনীতির কোন ফাঁকে কি গলদ আছে—সে সব কথায় তোদের কি দরকার রে বাপু? সারারাত ধরে ওই নিয়ে বাক্যব্যয় করলেই কি কিছু মীমাংসা হবে?

লাভের মধ্যে বলাকা দেবীকে বসে থাকতে হচ্ছে মুখে কুলুপ এঁটে।

ঝুনো নারকেলে দাঁত ফোটাবার মত জোরালো দাঁত পাবেন কোথা ?... বড় জোর—বলতে পারেন..."হলদে মুখোদের হ'ল কি ? একেবারে যে ঠাণ্ডা মেরে গেল !.. ইনকাম্‌ট্যাক্সটা আবার বাড়িয়ে দিলে ? নাঃ আর পারা যায় না বাবু।...রাও বিলটা পাশ না হলে আর চলছে না বাবা"।

একবার উঠলেন—ফুলদানীতে সাজানো কাগজের ফুলগুলো ঠিক করলেন...টেবিলে দু'একখানা বই পড়েছিল তুলে রাখলেন সেলফে...আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে অন্যের অলক্ষ্যে চুলটা ঠিক করে নিলেন দু'বার...শাড়ীর পাড়টাকে টেনে টেনে চোস্ত করে সাবধানে বসিয়ে দেন বুকের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়—ব্লাউসের শিল্প-সৌন্দর্য্য, হারের পেনডেণ্টটি অযথা ঢাকা না পড়ে !...

কানে এল কথা পড়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে—নিজের স্বাধীন মতটুকু জানাবার লোভ সংবরণ করতে পারেন না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপহাস্যে বলেন...

—আপনি ডাইভোর্স বিলের বিপক্ষে নাকি ?

—কেন আপনিই কি সপক্ষে নাকি ?

—দরকার বুঝলে নিশ্চয়ই।

—কিন্তু দরকার বোঝার তো কোনো একটা লিমিট নেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি। আমাদের গ্রামে একটা বাগ্‌দী বৌ আছে, বরের কাছে মার খেয়ে খেয়ে তার হাড় চূর্ণ। প্রায়ই আসে—আমার কাছে ওষুধ খেতে আর আইডিন নিতে—তবু বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করে না। অথচ —ওদের সমাজে ও প্রথা আছে ;...কিন্তু ধরুন আপনি—প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি স্যুট্‌ না পরে খদ্দর ব্যবহার করেন বলে হয়তো প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন ডাইভোর্সের। তবে ?

—কিন্তু এই তো রাওবিলের মধ্যে সাতটা বিশেষ কারণ দেখাবার আইন বেঁধে দিয়েছে!

—দিয়েছে—নতুন কিছুই নয়। সেই মনুর আমলের "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" গোছেরই, কিন্তু সত্যিই যদি তাতে সমাজ ব্যবস্থার কিছু সুরাহা হ'ত তা'হলে মনুর আইনই চালু থাকতো। সমাজের অকল্যাণকর কোনো আইনই টিঁকে থাকতে পারে না, বুঝলেন? বিবাহ-পদ্ধতিও তো আট রকম আছে শুনতে পাই, চলেনি কেন?

—সে তো পড়েই আছে কথা। শাস্ত্রকার পুরুষ, কাজেই পুরুষের সুবিধে বুঝে ব্যবস্থা!

—আর এতে কি আপনাদেরই খুব সুবিধের আশা করছেন?

—কেন নয়? বাঙলাদেশের কত মেয়ে কত অত্যাচার সহ্য ক'রে মুখ বুজে স্বামীর ঘরে দাস্যবৃত্তি করে জীবন কাটাচ্ছে—

—এটা আপনার নিছক শোনা কথা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, কারণ যথার্থ অত্যাচারের স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই নেই আপনাদের। ড্রইংরুমে বসে গল্প করবার জিনিস সে নয়। কিন্তু তাদের দুঃখের কোনো উপশম হবে আপনাদের নতুন আইনে? গ্যারান্টি দিতে পারেন তার? নির্য্যাতন সহ্য করে কারা জানেন? নিতান্ত নিরুপায় যারা তারাই।… সেই সব সহায় সম্বলহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, হয়তো রূপযৌবনহীন মেয়েরা কিসের জোরে আইনের সাহায্য নিতে যাবে? কোন সাহসে? কে লড়তে যাবে তা'দের হয়ে? মেয়েদের ভরসার মধ্যে তো বাপের বাড়ী? কিন্তু তারাই বা কে চাইছে—অনেক কষ্টে গোত্রছাড়া করে ফেলা মেয়ে আবার ফিরে আসুক তাদের নিরুপদ্রব সংসারে? হয়তো একা নয়—দু'চারটি শিশুবাহিনী নিয়ে? আর যদিই আসে—লাঞ্ছনার কিছু কসুর কি সেখানেই হবে? দুঃখী দরিদ্র নিরন্নের দেশে ভাত কাপড়ের দামটাও কম

নয় মিসেস চ্যাটার্জ্জি। আমরা যাকে 'ছোটলোক' বলি—তাদের সমাজে বিচ্ছেদ প্রথা আছে কেন জানেন? তাদের মেয়েরা উপার্জ্জনক্ষম বলে। দরকার হলে গতর খাটিয়ে খেতে পারবে বলে।...অপর পক্ষে দেখুন—সাহস বেড়ে গেল আপনাদের পরম শত্রু পুরুষদেরই। মিথ্যে বদনাম দিয়েও স্ত্রী ত্যাগ করা চলতে থাকবে। তবে সত্যিই যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তারা আইনের সাহায্য না নিয়েও পৃথক থাকতে পারে, বুঝলেন? কেউ আটকাতে পারে না। কোন আইনই নয়।

—আবার বিয়ে করতে পারে না তো?

—রুচি থাকলে। অবশ্য হিন্দু আইনে পুরুষেরাই পারে, মেয়েরা নয়। কিন্তু পারলেই বা পাচ্ছে কোথা? যে দেশে কুমারী মেয়েকে চালাবার জন্যেও মোটা ঘুষ দিতে হয়, সে দেশে স্বামীত্যাগিনী স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী জুটবে বলে আশা করেন? হয়তো একটা দৈবাৎ। তাও ছেলেপুলে থাকলে হয় কিনা বলা শক্ত।

—সেই জন্যেই তো পিতৃসম্পত্তির অংশ পাওয়া দরকার ডাক্তার গুপ্ত! মেয়েদের তাহলে—

—হাসালেন আপনি মিসেস চ্যাটার্জ্জি! পিতৃসম্পত্তি! পিতৃসম্পত্তি! যে দেশে গড়ে মাথা পিছু সাড়ে পাঁচ আনা মাসিক আয়—তাদের আবার পিতৃসম্পত্তির বড়াই! বড়লোকের সংখ্যা তো মুষ্টিমেয়! তাদের নিয়ে বিচার করলে চলবে কেন? বেশীর ভাগ কারবার তো সেই সাড়ে পাঁচ আনা নিয়েই? ক'জন ভাগ্যবান পিতা—ছেলেমেয়েদের ভাগ করে নেবার মত সম্পত্তি রেখে মরতে পারে? সম্পত্তির মধ্যে তো বুড়ো মা, বিধবা স্ত্রী, নাবালক সন্তান, আর মহাজনের ধার। মেয়েরা নেবে এ সম্পত্তির অংশ? তার বেলায় তো আইন বোবা।

—কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরা কি আজকাল নিজেদের জীবিকার্জ্জন করছে না?

প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি এতক্ষণ নীরবে একখানি বাসি খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিলেন—এবার গম্ভীরভাবে বললেন—বিবাহ বিচ্ছেদের প্রচলন হলে তোমার আগে যে আমাকেই যেতে হবে আদালতে সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধির অভাব আশা করি নেই তোমার? কিন্তু তার আগে —যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ 'ঘর সংসার' দেখ।

এই প্রফেসরের পরিহাসের ধরণ। এত গম্ভীর ভাবে বললেন, মনে হবে সত্যিই বা। এটা হ'ল অতিথি-সৎকারের দিকে মন দেবার ইঙ্গিত—এই ঘর সংসার দেখার অনুরোধ।

এতক্ষণে—খেয়াল হয় বলাকা দেবীর যে অনেক আগেই অর্ডার দিয়েছেন চায়ের, এখনো এসে পৌঁছয়নি। রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। এইসব চাকর বাকর দিয়ে কোনো কাজ যদি সময়ে হয়!···চাপরাস আঁটা মুসলমান বয়-বাবুর্চ্চির স্বপ্ন··স্বপ্নই রয়ে গেল বলাকা দেবীর জীবনে। সত্যি, ইচ্ছামত অর্থস্বাচ্ছল্য না থাকলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।···

আর নির্ম্মলাই বা কি করছে? বুড়োধিঙ্গি মেয়ে কোনো কাজে যদি লাগবে? কেন, বাইরে ভদ্রলোক এসেছে জানলে চা জলখাবার পাঠিয়ে দেবার বুদ্ধি হয় না কেন?

উঠে গিয়ে দরজার পর্দ্দাটি ঈষৎ সরিয়ে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দেন···

—বয়! বয়! কাঁহা গিযা থা তোম উল্লু?

হিন্দি না বলে ছাড়বেন না বলাকা দেবী। ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করেও বলবেন।

—'বয়' ডাকটা ও একটু দেরীতে শোনে বলাকা, কেন শ্রীপতি নামটা তো মন্দ নয়।

নিরীহভাবে কথাটি বলে আবার কাগজ উল্টোতে থাকেন প্রফেসর।

—ওই জন্মেই তো চাকর-বাকর এরকম বে-সায়েস্তা হয়ে উঠেছে—বলাকা দেবী ফিরে দাঁড়িয়ে বোধ করি শ্রীপতির পাওনাটাই স্বামীর উপর বর্ষণ করেন—তোমার এই মিইয়ে পড়া স্বভাবের জন্মে। চাকর ঠিক রাখতে হয় ধমকের ওপর। আজই সব ক'টাকে দূর করে দেব আমি।

—ক'টার মধ্যে তো একটাকেই শুধু দেখতে পাচ্ছি বলাকা—শ্রীপতি। আর কই?—আমি নয় তো?···প্রফেসর করুণ ভঙ্গী করেন।···

আপাদমস্তক জ্বলে যাবার পক্ষে কি এইটুকুই যথেষ্ট নয়? চাকর যে মাত্র একটাই সেটা জাহির করে বেড়াবার কি আছে? বাইরের লোকের কাছে হাঁড়ির খবর সব বলতে হবে? সৌষ্ঠব বলে জিনিস নেই সংসারে?···অথচ বরাবর লক্ষ্য করেছেন বলাকা দেবী, যখনি তিনি বাইরের লোকের কাছে সৌষ্ঠব রাখবার জন্মে অনেক বুদ্ধি খরচ করে—অনেক প্ল্যান খাটিয়ে একটি কথা বলবেন—তখনি কর্ত্তার পরিহাস-স্পৃহা চেগে উঠবে। পরিহাসের ছলে স্ত্রীকে অপদস্থ করাটাই তাঁর প্রধান সুখ বোধ হয়। কেন, কি ক্ষতি হ'ত—বাড়ীতে দ্বিতীয় চাকর নেই একথাটি অভ্যাগতকে না জানালে?

দুই চোখে ক্রোধ অভিমান, অপমানের জ্বালা—সবকিছুর জ্বলন্ত আগুণ ফুটিয়ে তুলে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই না শোনার ভানে পর্দ্দা সরিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যান।

কিন্তু শ্রীপতি বেচারারই বা দোষ কি? নির্ম্মলা তাকে বাজারে পাঠিয়েছে ডিম আর মাখন আনতে।

পাশের ঘর থেকে বলাকা দেবীর বিস্মিত কণ্ঠের প্রশ্নে ধরা পড়ে সে ইতিহাস···"কী আশ্চর্য্য ডিম নেই? ফুরিয়ে গেছে? ফুরোবার আগে আনিয়ে রাখতে পারো না?···কী করো সারাদিন···কাজের মধ্যে তো

কিচেন রুমের তদারক করা···তা'ও হয়ে ওঠে না, আশ্চর্য্য! বাটার কি আজকাল গায়ে মাখা হচ্ছে? দৈনিক একটা করে টিন উড়ে যাচ্ছে?··· হাসছো? হাসতে লজ্জা করে না তোমার? আশ্চর্য্য!" উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটী যে কে সে কথা মিহির গুপ্ত না বুঝলেও প্রফেসর বোঝেন। তিনিও ভাবেন···আশ্চর্য্য! নির্ম্মলাকে গড়বার সময় রাগ জিনিসটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন না কি বিধাতাপুরুষ?

অপ্রতিভ হওয়ার অভ্যাস ডাক্তারের কোষ্ঠিতে নেই, তবু তিনিও যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ বোধ করেন। একপেয়ালা চা, যেটায় তাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, তার জন্যে বাড়ীশুদ্ধ লোক ধমক খাবে এটা সত্যিই সহ্য করা কঠিন।

তিনিও ভাবেন—আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য এই বলাকা দেবী! শালীনতার অভাব যে কতদূর পীড়াদায়ক সেটা যেন এঁকে দেখে নতুন করে উপলব্ধি করা যায়।

কিছুক্ষণ আগে যে তিনি নিজেই চায়ের কথা তুলেছিলেন সে কথা ভুলে গিয়ে বলাকা দেবীকে ফিরতে দেখে বলেন—দেখুন আমার জন্যে আর চা বলবেন না, এসময় আমার অভ্যাস নেই।

—বা রে, তাই বলে আপনাকে অমনি ছেড়ে দেব বুঝি?···

আবদারে কণ্ঠস্বর তরল হয়ে আসে। কে বলবে এই কণ্ঠই বিষ উদ্গীরণ করছিল এতক্ষণ!

হঠাৎ প্রফেসরের পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে হয় ডাক্তারের, তবে—সেটা নাকি নাটুকেপনা দেখায় তাই চুপ করে থাকেন।

—কত ভাগ্যে পাওয়া গেছে আপনাকে—বলাকা দেবী পূর্ব্বকথার জের টানেন—আমি তো ভেবেছিলাম—ভুলেই গেছেন।

—আপনাকে ভুলবো? জীবনে নয়।

প্রফেসরের সামনেই এই সরল প্রেমোক্তিটুকু করেন ডাক্তার।

পর্দার ফাঁকে শ্রীপতির মুখ দেখা গেল। বোধ হয় কিছু বলতে চায়।

কী ভাগ্যি আর বেশী বকাবকি না করে বলাকা দেবী ভারীক্কি গলায় বলেন—"যাও, জল্‌দি তিন পেয়ালা চা আউর টোষ্ট ডিম। একঠো ডবল, দোঠো সিঙ্গল—সমঝাতা? হাঁ আউর নির্ম্মলা দিদিকো পুছো কুছ মিঠাই হ্যায় কি নেই?"

বাঙালী ভৃত্যের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অযথা এরকম 'হিন্দুস্থানী রদ্দা'র অত্যাচার দেখে মনে মনে ভারী কৌতুক বধ করছিলেন ডাক্তার, সহসা চমকে সোজা হয়ে বসেন।...

নির্ম্মলা দিদি? নির্ম্মলা দিদি কে? ঠিক শুনেছেন তো? নির্ম্মলা এখানে এল কি সূত্রে? কে সে এই অদ্ভুত খিচুড়ি পরিবারের? কিন্তু নির্ম্মলারা তো ঘোরতর হিন্দু ছিল, যার জন্যে ব্রাহ্মণ কন্যার মর্য্যাদার কাছে খাটো হয়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল মিহির গুপ্তকে। কিন্তু...এ আবেষ্টনটা কেমন?...অবশ্য প্রফেসরগিন্নি যতটা বেপরোয়া ভাব দেখাতে চান প্রফেসর নিজে তেমন নয়।—হয়তো কর্ত্তারই কোনো আত্মীয়া—হয়তো শ্বশুর বাড়ীর কেউ।—বিধবা মেয়ে একজন কারুর গলগ্রহ তো হবেই।—তাকেই ধমক লাগাচ্ছিলেন না তো গিন্নি?—চা টোষ্ট নিয়ে সে নিজেই আসবে না কি? কেমন দেখতে আছে সে? কত বুড়ো হয়ে গেছে?—বাঙালীর মেয়ে তো বিধবা হলেই বুড়ি!—সত্যিই যদি নির্ম্মলা এসে দাঁড়ায় এখানে?

কি বলবেন মিহির গুপ্ত?—হঠাৎ মনে মনে হেসে উঠলেন ডাক্তার। মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি তাঁর—'নির্ম্মলা' 'নির্ম্মলা' জপ করে?

এ যে আকাশে, অন্তরীক্ষে নির্ম্মলার ছবি দেখছেন! নির্ম্মলা নামটা কি পথে ঘাটে হাজারটা ছড়ানো নেই? পঞ্চুর মার সেই পীলেপেটা শুঁট্‌কি ভাইঝিটার নামই যে নির্ম্মলা!

শ্রীপতির হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলেন—হ্যাঁ কি বলছিলেন প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি, আপনাদের কলেজে অবিনাশ সিংহী এখনো আছেন ?

পাশের ঘরে···ষ্টোভ নিভিয়ে ইতস্ততঃ ছড়ানো চায়ের সরঞ্জামগুলোর সামনে বসে নির্ম্মলা অবাক হয়ে ভাবছিল···কোথায় যেন শুনেছে···কতদিন যেন শোনেনি···এই উদাত্ত কণ্ঠস্বর, এই প্রাণখোলা হাসি···কিন্তু অসম্ভব কি সম্ভব হয় ?···একটা দেওয়ালের ব্যবধান কী অলঙ্ঘ্য !

অসম্ভবের আশা করবার মত বাজে সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে নির্ম্মলা নয়, তবু কেন যে দোতলার ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ায় এই আশ্চর্য্য। শুধু মাথার চাঁদিটুকু দেখলেই কি আর চেনা যায় লোককে ? পাঁচ সাত বছর পরে, কোঁকড়ানো চুলে টাক ধরাও তো বিচিত্র নয় !

মিহির ডাক্তার পথে বেরিয়ে ভাবছিলেন আর এক কথা···ধর জীবনটা যদি উপন্যাস হ'ত !···ঠিক এই সময়ে "অধীর আকাঙ্ক্ষায় নায়ক হাঁ করে তাকাতো ঊর্দ্ধপানে, আর প্রাসাদবর্ত্তিনী নায়িকা চাইতেন পথ পানে"—ব্যস্। মিটে গেল সব ঝঞ্ঝাট···নায়কের—নায়িকার—এবং লেখকেরও! বাকী পৃষ্ঠাগুলি মিলনানন্দে ভরপূর। কিন্তু জীবনটা উপন্যাস নয়, কাজেই ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের জানলার দিকে হাঁ করে তাকাতে পারে না। তাই মাথা নীচু করেই চলে যেতে হয়।

দূর ছাই, হতভাগা কলকাতাকে ত্যাগ করাই ভালো।

'এখানে নির্ম্মলা আছে' এই চিন্তাটাই হয়েছে ভারী অস্বস্তিকর।

যেখানে নির্ম্মলার ছায়ামাত্র নেই সেখানে ফিরে গেলেই আপদ চুকে যায়।

বোকা ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে নিখিল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে—তারপর তর্কচূড়ামণির খবর কি? সাড়া শব্দ নেই যে? খুব পড়া হচ্ছে বুঝি?···কিছু মনে করবেন না, নমস্কার। আপনিই বোধ হয় একে পরীক্ষাসাগর পার করাবার ভার নিয়েছেন? খাটুনীটা কি রকম মনে হচ্ছে? খুব ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রীটি আপনার না!

এরপর চুপ করে থাকা মণির পক্ষে সম্ভব নয়—আচ্ছা নিজে তো খুব বিদ্বান্ তা'হলেই হ'ল—বলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

—শুধু মগজটাই নয়—মেজাজটিও আপনার ছাত্রীর বেশ ওজনে ভারী, কি বলেন? কিছু কিছু প্রমাণ পাচ্ছেন তো?

অনেকদিন পরে পরিচিত প্রিয় ব্যক্তিকে দেখলে যেমন সারা হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তেমনি একটা অব্যক্ত আনন্দে ভরে ওঠে কল্যাণীর মন। প্রসন্ন হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শ্যামল মুখ।

সাধারণতঃ অপরিচিতের কাছে লজ্জাটা তার বেশী, কথা কয় কম, তবু নিখিলের কথায় হেসে উত্তর না দিয়ে পারে না।

—কই আমি তো এখনো মেজাজের প্রমাণ কিছু পাইনি, আপনি যদি পেয়ে থাকেন—

—ধারে কাছে যে আসবে সেই পাবে ভয় নেই, আপনি যদি—নাঃ থাক্, এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে হয়তো—

না রাগালে কথা আদায় হয় না যে, কাজেই রাগিয়ে দিতে হয়।

মণি আর সহ্য করবে না—বেশ বেশ, কাঁদি কাঁদবো, আপনার কি? আপনাকে তো আর ভোলাতে হবে না—বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—ভোলাতে হবে না তা'র বিশ্বাস কি?—বলে চাপা হাসি হেসে কল্যাণী ওকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

আর কল্যাণীর এই চাপা হাসি দেখেই নিখিলের সমস্ত বাচালতা স্তব্ধ হয়ে যায়। নিশ্চয়ই মণি বলেছে তাদের গোপন তথ্য, শিক্ষয়িত্রী বলে সম্মান রেখেছে বলে মনে হচ্ছে না, নইলে ও হাসির অর্থ কি? আচ্ছা—সুরেশবাবুরই বা কী আক্কেল! এতটুকু মেয়েকে মাষ্টারণী রাখা কেন? করবেই তো ফাজলামী, জবরদস্ত একজন বাঘা মাষ্টার রাখলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

এর সামনে এখন সপ্রতিভ হওয়া যায় কি করে?

কল্যাণী এই অবসরে ভালো করে চেয়ে দেখছিল নিখিলকে…নাঃ, সন্দেহ করবার কিছুই নেই। বিভূতিবাবুর তরুণ বয়সের ফটো বললেও চলে, শুধু আগুনের মত অত উজ্জ্বল রং নয় গায়ের।

—তারপর, মাসীমা কোথায়, মেসোমশায় কোথায়? মল্লিটা পালালো, আর এলো না যে?

—এই এলো, চলুন মা আপনাকে ডাকছেন।—বলে মল্লি এসে দাঁড়ালো।

—আমিও আজ উঠি, বন্ধুর সঙ্গে গল্পসল্প করো তুমি—বলে মণির হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কল্যাণী।

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন যে নিখিল তাকে চেনে না, কিন্তু মল্লিনাথের টীকার দৌরাত্ম্য কে সামলাবে? কোন দুর্ব্বুদ্ধির বশে যে কল্যাণী নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বার পথ পরিষ্কার করে রাখলো!

কল্যাণী চলে গেল, কিন্তু নিখিল অত চট্ করে উঠবে কি করে? একবার মাসীমার কবলে পড়ে গেলে তো আর রক্ষা নেই! অথচ

এতদিন পরে মণির সামনে দিয়ে চলে যাবে একটি কথার বিনিময় না করে!

মণি বলে মিথ্যে নয়, সাংঘাতিক "পাকা পক্কান্ন" ছেলে এই মল্লিনাথটি। ঠিক এই সময়ে উধাও হয়ে যেতে কে বলেছিল তা'কে?

—চিঠির উত্তর না পেয়ে রাগ হয়েছে?

—রাগ হবে কেন?

—হবে কেন তা'তো জানতে চাইনি, হয়েছে কিনা···

—হয়েছে—খুব হয়েছে—কি করবেন?

—যা ইচ্ছে হচ্ছে তা' করতে পারবো না, কাজেই ক্ষমা চাইবো। কি হল—মাথাটা ঠুকে গেল যে টেবিলে, চিঠিতে কত কথা কইতে—সামনে এত লজ্জা কেন?

—আপনি এত দুষ্টু কেন?

—দুষ্টু না হলে তর্কচূড়ামণির সঙ্গে পেরে উঠবো কি করে?

—আহা!

—মণি!

—মণি মুখ তুলে চাইলো।

—মন কেমন করতো?

—আপনার জন্যে আমার মন কেমন করতে দায়।

—খালি খালি 'আপনি' বলতে ভাল লাগে তোমার!

—কি বলবো তবে?

—'তুমি' বলতে পারো না? বল না একবারটি—

—আপনি তা'হলে 'তুই' বলুন।

দুষ্টুমির হাসি হেসে ছুটে পালিয়ে যায় মণি।

ঠিক এই সময়ে নিখিলের দেরী দেখে তরুবালা নীচে নেমে আসছিলেন —উচ্ছ্বসিত আনন্দে চঞ্চল ছুটন্ত মেয়ের সঙ্গে খেলেন ধাক্কা।

ধাক্কা যে শুধু শরীরেই খেলেন তা নয়, খেলেন মনেও। এ আনন্দের স্বরূপ চিনতে ভুল হয় না, অন্ততঃ মেয়েমানুষের হয় না। হঠাৎ দুরন্ত রাগে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে তরুবালার।

…না; কিছুতেই না, তাঁর শান্তির সংসারে অশান্তির চারা গজাতে দেবেন না তিনি। এই বেলা—এখুনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে।…কি করবেন? এই দণ্ডে গিয়ে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে আসবেন ছেলেটাকে, না কি মেয়েকেই কসে দু'ঘা চড়িয়ে দেবেন?…বড় হয়েছে? হোক… মেয়েকে অত ভয় করে চলবার দরকার নেই। তরুবালার সংসারে তরুবালার শাসন মাথা পেতে নিতে হবে সকলকেই।

চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল সুরেশবাবুর বিস্মিত প্রশ্নে।

—একি! তুমি এখানে এমন ভূতে পাওয়ার মত দাঁড়িয়ে আছ যে?

—ভূত? হ্যাঁ ভূতেই পেয়েছে আমায়।

—একটা ভূতে তো পেয়েই বসে আছে—আবার নতুন কে এল?

—সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না বুঝলে?—তরুবালা ঝেঁজে ওঠেন।

—কি হ'ল? মেজাজ অত খাপ্পা কেন?

—কেন আবার? যার জ্বালা পোহাতে হয় সেই বোঝে। নিজে তো কিছু তাকিয়ে দেখবে না—চিনেছ খালি মক্কেল আর নথী। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখেছ কোন দিন?

—কেন? অসুখ করেছে বুঝি? তাকিয়ে দেখিনি মানে? এই তো কালই বলছিলাম—'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন'?

—ওই 'কেন'টিই যে সর্ব্বনাশের মূল। মেয়ে যে 'লভ্' করতে শিখেছেন তার খোঁজ রাখো?

—ছিঃ তরু, ও রকম বে-আব্রু কথাবার্ত্তা বোলো না।

সুরেশবাবু গম্ভীর হয়ে ওঠেন।

—তবে থাক, তোমার সংসার তুমি বুঝো—তরুবালা অভিমানে 'গোঁজ' হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

—রাগের কথা নয় তরু, নিজেদের সম্ভ্রমের কথা। ছেলেমেয়েরা যদি আমাদের কাছে সৎশিক্ষা না পায় তবে আমাদের শ্রদ্ধা করবে কেন?

—আর এই যে তুমি এতদিন সৎশিক্ষা দিয়ে এলে কি ফল পেলে? ছেলেটি তো দুষ্টুমিতে ডাকাত হয়ে উঠছে দিন দিন, আবার মিছে কথাও শিখেছেন। এই তো সেদিন—

সুরেশবাবুকে যতটা 'উদোমাদা' মনে করা যায় ঠিক ততটা নয় দেখা যাচ্ছে। তরুবালার কথায় বাধা দিয়ে আরো একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—ছেলেরা কেন মিছে কথা বলতে শেখে জানো তরু? অন্যায় শাসনে। অহেতুক ভয়ে তা'দের স্বাভাবিক বুদ্ধি গুলিয়ে যায়···আত্মরক্ষা—যা মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম—তারই তাড়নায় মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়।

—ও···তা'হলে আমার অন্যায় শাসনেই তোমার ছেলেমেয়ে বিগড়ে গেছে! তা বেশ। কিন্তু এই যে মেয়েটি? সদা সর্ব্বদা অত উড়ুউড়ু মন কিসের জন্যে? আমাদের কাছে আর তেমন করে সরল ভাবে গল্প নেই, কাছে বসা নেই কেন? তবেই না তদন্ত করতে হয় আমায়! মায়ের যে কী জ্বালা সে মায়েরাই জানে। আমি বলছি এ সব ওই বয়াটে ছোঁড়ার সঙ্গে মেশার ফল।

তরুবালা আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

—বয়াটে ছোঁড়া?—সুরেশবাবু আকাশ থেকে পড়েন—সে আবার কে?

—কেন তোমার ওই আদরের নিখিল! 'ভালো ছেলে' বলে বাড়ীর

ভেতর আসা যাওয়া করতে দিয়েছি, তা এই কি ভালো ছেলের কাজ? ভদ্দর লোকের ঘরের সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে রং তামাসা করতে আসার কি দরকার তোর? তুই বড় লোকের ছেলে আছিস আছিস—দু'পাঁচলাখ টাকার জমিদারী আছে তোদের আছে, আমরা তার কি ধার ধারি? গরীবের মেয়েটাকে বিয়ে করতে আসবি?—তাই 'লভ্' করতে এসেছিস? 'মাসী' বলে ডাকিস—বোনপোর মতন যত্ন-আত্তি করি, চুকে গেল। আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার আস্পর্দ্ধা হয় কিসের জন্যে? ওসব রাজপুত্তুর বলে কেয়ার করবো না আমি। আর দু'দিন দেখি—আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব বাছাধনকে।

তরুবালার বক্তৃতায় বিরক্ত হয়ে সুরেশবাবু চটে মটে বলে ওঠেন—তিলকে তাল কোরোনা বাবু, দুটো হাসি-গল্প করলেই 'লভ্' হয়ে গেল? বাড়ীতে তো সঙ্গীর মধ্যে এই বুড়ো মা বাপ, সমবয়সী পেলে ভাব করবে না?

—সমবয়সী?

তরুবালা অবাক হয়ে গালে হাত দেন।

—আঃ, সমবয়সী মানে আর কি ইয়ে—সমশ্রেণী ধরো। মেয়েরা বয়সের চেয়ে আগে বাড়ে কিনা! এই তোমার কথাই মনে করোনা—কী সাংঘাতিক দুষ্টু ছিলে! ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া কথাই কইতে না—তোমারই তো মেয়ে!

তরুবালা চোখ পাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন—আমি কার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে বেড়াতাম শুনি?

—কেন আমার সঙ্গে।

—সেই তুলনা দিচ্ছ তুমি! বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়।

—আহা বুঝতে পারছো না, হাতের কাছে লোক পেয়েছিলে তাই,

নইলে তো হাভড়ে বেড়াতে।

—তার আগে গলায় দড়ি দিতাম।

নিখিল আশা করেছিলো মাসীমা এসে আপ্যায়ন করবেন, কিন্তু এলেন সুরেশবাবু। নিতান্তই যেন অতিথির কাছে ভদ্রতার দায়ে। মিনিটকয়েক পরে অতিথি উঠে পড়লো কাজের ছুতোয়।

ঠিক আগের অবস্থাটা যে নেই, এটা ধরা পড়ে গেলো তার চোখে।

পথে বেরিয়ে ভারী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে নিখিল।

কেন এমন হলো?

স্পষ্ট কোনো ঘটনা না ঘটলেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ বাড়ীতে নিখিলের পুরনো জায়গাটা গেছে হারিয়ে! কিন্তু কেন? তন্ন তন্ন করে ভাবতে চেষ্টা করে নিখিল, কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

তবে এখন কি করবে নিখিল? নিজের আত্মসম্মান নিয়ে আস্তে আস্তে সরে যাবে? মণির সঙ্গে আর দেখা হবে না?

হঠাৎ যেন সমস্ত মনটা 'হায় হায়' করে ওঠে। মণির সংস্রব ত্যাগ করাটা কি তবে শক্ত! কে মণি? কতোটুকুই বা সম্পর্ক তা'র সঙ্গে? ক'দিন সে পেয়েছে মণির সঙ্গে একলা একটা কথা বলতে?···সকলের মাঝখানে হয়তো এক টুকরো হাসি, তুচ্ছ একটু কথা, অকারণ একটা সম্বোধন! শুধু তো এই! কি আসে যায় সেটুকুর অভাবে?

নাঃ, মনকে বোঝানো অতো সোজা নয়, তার কাছে যুক্তির বালাই নেই, তাই বোবা একটা বেদনায় স্তব্ধ হয়ে থাকে মন।

বাসায় ফিরে জগন্নাথের কাছে ক্ষুধাহীনতার ছুঁতো দেখিয়ে চলে গেলো ছাতে।

আর কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে

লাগলো—না মণির কথা নয়, বাবার কথা। কখন যে চিন্তার ধারাটা অন্য পথ নিয়েছে টের পেলো না।

কোথায় রয়েছেন বিভূতি লাহিড়ী ?

কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তীর্থের নামে। কী করছেন তিনি একাকী নিঃসঙ্গ হৃদয়ের বোঝা নিয়ে! কে সান্ত্বনা দেবে সেই চির গম্ভীর মানুষটিকে ?

ছোট্ট মণি, কতোটুকু বা তার আকর্ষণ! সেইটুকুই যদি এতো তীব্র হয়, এতো দুঃসহ মনে হয় তা'র অভাব বোধের বেদনা, তবে কি দিয়ে পরিমাপ করা যাবে কেন্দ্রচ্যুত বিভূতিভূষণের দুর্বিষহ বেদনার বোঝা ?

কিন্তু কোথায় সেই অপরূপ নারী ?

যে বন্যার জলের মতো হঠাৎ এসে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো আদর্শনিষ্ঠ মহাপুরুষের সারা জীবনের সঞ্চিত গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ?

তবু রাগ আসে না কেন তার ওপর ?

না মন কেমন করে যেন।···আচ্ছা আগে হলে কি এতো কথা বুঝতে পারতো নিখিল ?

ছোট্ট মণি, তার মধ্যে এনে দিয়েছে এই বোধ, এই চেতনা।

কিন্তু মানুষ কি এক অর্থহীন আত্মসম্মানের দাস! প্রাণ যাক, তবু নিখিলের উপায় নেই মণির অভিভাবকদের কাছে হীনতা স্বীকার করবার। বিভূতিবাবুর উপায় ছিলো না আপন সন্তানের সামনে দুর্ব্বলতার সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়াবার।

মাথা হেঁট হবে। মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

সারা জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাক, শুধু মাথাটা না হেঁট হয়। কিন্তু মাথা হেঁট হবার সীমা-রেখাটা কে কবে নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছিলো ?

কেউ জানে না আত্মসম্মানের আইন কা'র গড়া। তবু সেই আইনের

চাপে বিভূতিবাবু হারিয়েছেন তাঁর মানসী প্রিয়াকে, হয়তো নিখিলকেও হারাতে হবে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্নকে।

তবু সহজে কি হারানো যায়?

'হারিয়ে গেলো' বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়? শহরের বিশেষ একটি রাস্তা অবিরত দুরন্ত বেগে আকর্ষণ করতে থাকে, সমস্ত হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। মান-অপমানের সূক্ষ্ম বিচারবোধ তুচ্ছ মনে হয়।

কি এসে যায় তরুবালা যদি নিতান্তই প্রসন্ন হাস্যে অভ্যর্থনা না করেন? এতো কি ক্ষতি, যদি সুরেশবাবু সস্নেহ আলোচনার মাঝে বার বার অদূরবর্ত্তী এম-এস-সি পরীক্ষার ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেন?

অবুঝের ভাণ করলেই তো চলে যায়।

ব্যস্ততার ভাব বজায় রেখে একটিবার শুধু ঢুকে পড়া, অন্তত কয়েকটা মিনিটের জন্য!

ধরো ওই পথেই যদি নিখিলের 'বিশেষ কোনো কাজ' থাকে? যেতে যেতে পরিচিত বাড়ীটায় একবার ঢুকে পড়ে কুশল প্রশ্ন করে যায় না মানুষ?

নীচের তলার ঘরে ধরো মণিই রইলো একা!

তা'তে কি এতো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেলো? নিখিল তো প্রেমের কথা কইতে আসছে না! শুধু তরুবালার অম্বল-শূলের ব্যথাটা আর চাগলো কিনা, সুরেশবাবুর দাঁত তোলানোর কি হলো, অথবা মল্লিনাথের সর্দ্দি-কাশিটা নির্দ্দোষে সেরেছে কি না, এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নেওয়া!

মণি কি আর নিছক্ একা বসে থাকে প্রেমালাপের সুযোগ দিতে? থাকে মল্লিনাথ, থাকেন ওদের সেই নতুন দিদিমণি!

তা' লোক-টোক থাকাই ভালো। বুকে তবু একটু সাহস থাকে।

কথাবার্ত্তা সহজে কওয়া যায়। একেবারে একলা মুখোমুখি হয়ে পড়লে, একটা কথাও কি মুখ দিয়ে বেরোবে ?

তা' ওদের দিদিমনিটি বেশ লোক ভালো !

এতো সুন্দর কথাবার্ত্তা, কেমন একটি মর্য্যাদাপূর্ণ গম্ভীর ভাব ! কেমন যেন বড়োর মত লাগে।

নিখিলেরও ইচ্ছে হয় ওদের মতো 'দিদি' বলে ডাকতে।

শেষ পর্য্যন্ত ভবানীপুরের দিকে 'বিশেষ একটা দরকার' পড়াতেই হয়। কারণ শেষ পর্য্যন্ত নিখিল স্থির করেছে, ভবানীপুরের সেই বাড়ীটায় ওর পুরনো জায়গাটা যে হারিয়ে গেছে, এ একটা কল্পনামাত্র। কে জানে হয়তো রজ্জুতে সর্পভ্রম করেই এতোদিন এতো কষ্ট পেল সে !

ঘরে ঢুকতেই দেখলো একা সুকল্যাণী বসে।

মণি আর মল্লিনাথ মায়ের সঙ্গে পাশের বাড়ীতে গেছে সত্যনারায়ণের সিন্নী উপলক্ষ্যে ! আশ্বাস দিয়ে গেছে এখুনি আসবে।

সুকল্যাণী মণিরই একখানা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো। নিখিলকে দেখে স্নিগ্ধ হাস্যে আহ্বান করলো—আসুন।

—একা যে ? ছাত্র-ছাত্রী পলাতক নাকি ?

—এক রকম তাই। ব্রতকথা শুনতে গেছে।

—ব্রতকথা ? এতো ধর্ম্মে মতি হলো যে ? তা'পর আপনার খবর কি ?

—এক রকম ! আপনার খবর ?

—ভালোই তা'পর ছাত্রী কেমন পড়ছে ?

—মন্দ নয়, আপনারও তো পরীক্ষার দুশ্চিন্তা ?

—দুশ্চিন্তা !···কিন্তু পরীক্ষার দুশ্চিন্তা তুচ্ছ হয়ে যায়, কতো সময় এমন দুশ্চিন্তাও এসে যায় মানুষের জীবনে !

দীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলে নিখিল।

সুকল্যাণী মনে মনে হাসে। আহা বেচারা! তোমার দুশ্চিন্তার কথা আমার অজানা নেই।···কিন্তু এমনি বয়সে সদ্যোত্থিত তরুণ হৃদয়ে প্রেম কী সুন্দর ? এ প্রেমের যন্ত্রণাটুকুও দেখতে মধুর, কৌতুককর।

সকৌতুক হাস্যে তাই বলে—কেন, আপনার আবার এতো দুশ্চিন্তা কিসের ?

—আছে আছে! বাইরে থেকে আমায় যা দেখছেন, ঠিক তেমন সুখী আমি নই।

সুকল্যাণী কৌতুক ছেড়ে কোমল কণ্ঠে বলে—তা' সত্যি, বাইরে থেকে কতোটুকুই বা বোঝা যায় মানুষকে ? তা ছাড়া লোক-ব্যবহার জিনিসটা এমনি বড়ো যে, ভিতরে হয়তো যখন প্রলয়ের ঝড় বইছে, তখন হাল্কা হাসি হেসে কথা কইতে হয় অন্যের সঙ্গে !

—ঠিক বলেছেন—একান্ত আগ্রহে সুকল্যাণীর হাতের ওপর একটা হাত রাখে নিখিল। বোধ করি অজ্ঞাতসারেই রাখে। ব্যগ্র কণ্ঠে বলে—ঠিক বলেছেন, আপনি অন্যের মনের কথা এতো সহজে বুঝতে পারেন! তাই বোধ হয় এতো ভালো লাগে আপনাকে !

সুকল্যাণী একটু বিপন্ন বোধ করলেও হাতটা ছাড়িয়ে নেয় না, তেমনি সহজ ভাবেই বলে—মনের কথা বোঝা শক্ত কি ? একটু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলেই তো—

—সেই তো কথা! সেই বিচার-বুদ্ধিটুকু যদি সকলের থাকতো—

কথা শেষ না হতেই পিছন থেকে একটি সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য উচ্চারিত হয়—বিচার-বিবেচনা সকলের থাকলে তো সংসারের লোক বাঁচতো, থাকে আর ক'জনের ?

তরুবালা এসে কখন দাঁড়িয়েছেন পিছনে।

তাঁর পিছনে মেয়ে ছেলে !

অপ্রতিভ অপরাধী-যুগলকে কিছু উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই তরুবালা আবার বলেন—এই দেখোনা, পড়াতে এসেছো, মন দিয়ে পড়াবে, এই জানি। তা নয় আমার বাড়ীতে কে আসছে যাচ্ছে তা'দের নিয়ে গল্পগাছা করে সময় নষ্ট করা ! এটাই বিবেচনার কাজ ?...নেহাৎ মেয়েটার একৃজামিন সামনে তাই, না হলে—যাক্, একটু বুঝে-সুঝে চললে কারুকে আর বলে-কয়ে হুঁস্ করিয়ে দিতে হয় না !

চারটি প্রাণীকে নির্ব্বাক করে রেখে সশব্দে ওপরে উঠে যান তরুবালা।

অতঃপর আর কি করবে নিখিল ?

সম্মান-অসম্মানের চেহারাটা যখন রূঢ় হয়ে দেখা দেয়, তখনও কি মানুষ হৃদয়-বৃত্তির দাসত্ব করবে ? ভদ্র শিক্ষিত পুরুষ মানুষ ?

আর সুকল্যাণী ?

তা'কে বোঝা যায় না।

অপমানের কালি তার মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো কই ? কী এক রকম অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাকে।

কিসের এতো অন্যমনস্কতা ওর, যে অপমানের তীব্রতা স্পর্শ করলো না ?

সেই সন্ধ্যার পর থেকে আর আসেনি নিখিল।

এদিকে পরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে মণির।

কিন্তু কোন মনটা দিয়ে পরীক্ষা দেবে বেচারা? শুধু-শুধুই যদি আসা বন্ধ করে দিতো লোকটা, তা' হলেও বরং কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যেতো। কিন্তু এ যে নিতান্তই মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে।

যখনি মণি মায়ের সেই ভীষণ কণ্ঠের শ্লেষ বাক্য আর নিখিলের আরক্ত-অপমানাহত মুখচ্ছবি কল্পনা করে, তখনি যে প্রাণটা আছাড় খেয়ে মরতে চায়।

পরে—মণিকে শুনিয়ে শুনিয়ে সুকল্যাণীর নামের সঙ্গে নিখিলের নাম জড়িয়ে অনেক বাঁকা বাঁকা কথাই বলেছেন তরুবালা, কিন্তু মণির কাছে সে সব কথা অর্থহীন।

একবার যদি কেউ কারুর হাত ধরে, ক্ষয়ে যায় মানুষ? এতো আর সে স্পর্শ নয়? যে স্পর্শে আলগোছে একবার ছোঁওয়া গেলেই সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, বুকটা হিম হয়ে যায়, ছুঁয়ে যাওয়া জায়গাটুকুতে স্পর্শের একটা শরীরী অনুভূতি স্থায়ী হয়ে থাকে। এ তো এমনি কথা কইতে কইতে হঠাৎ একটু হাত ধরা! এতে দোষ ধরে না মণি।

তাই যদি ধরবে—তবে তরুবালার সঙ্গে মনের তফাৎটা কোথায় তার?

দোষ ধরে না বটে, তবে ধৈর্য্য ধরেও থাকতে পারছে না আর। তারপর আর একবারটি যদি দেখা হতো!

অবশেষে কোনো প্রকারে একবার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে এক টুকরো চিঠির দূত পাঠিয়ে না দিয়ে পারে না।

একটিবার শুধু যে-কোনো ছুতোয়—

জগতের কোনোখানে কোথাও কি শূলবেদনার ভালো ওষুধ পাওয়া যায় না ? তেমনি একটা কিছু সংগ্রহ করা কি নিখিলের পক্ষে এতোই কঠিন ?

তরুবালার যন্ত্রণা উপশমের জন্যে যদি ভালোমত একটা শূলবেদনার ওষুধ যোগাড় করে আনতে পারে নিখিল, আসবার একটা উপলক্ষ্য তো হয় !

কি আর ক্ষতি—শুধু এইটুকু বলা এসে—"মাসীমা, আপনি এতো কষ্ট পান, একবার এটা ব্যবহার করে দেখুন ! শুনেছি বেশ উপকারী—"

তাতে কিছু আর তাড়িয়ে দেবেন না তরুবালা ?

আর বাড়ীতে এসে গেলে একটিবারও কি চোখোচোখি হবে না ? ব্যস্ তাহলেই তো হলো !

তা'হলেই তো সব বোঝা যাবে। সহজ হয়ে যাবে সব।

এতো বুদ্ধি অবশ্য চিঠির মধ্যে দিয়ে দিতে পারে না মণি, শুধু মনের মধ্যে ভীড় করতে থাকে—এই সব সম্ভব অসম্ভব নানা কল্পনা।

বাইরের ঘর থেকে বদলী হয়ে—ভিতরের দিকে একটা ঘরে পঠন-পাঠনের আসর বসছে আজকাল। অন্য সময় বোধ করি এ ঘরটায় ভাঁড়ারের কাজ চলে—শুধু সন্ধ্যাবেলায় সভ্যতা করে একটা ছোট টেবিল ও খানতিনেক বেতের চেয়ার পাতা হয়।

সেখানে পড়তে বসিয়ে দিয়ে, দরজার বাইরে দালানে থাবা-ধরা বাঘের মতো বসে থাকেন তরুবালা—হয়তো সুপুরী কাটার ছল করে, নয়তো বা আর কিছুর ছলে।

পড়তে পড়তে অস্থির হয়ে পড়ছে মণি। চাঞ্চল্য ধরা পড়ছে স্পষ্ট। যদি চিঠিটা পেয়ে আজকেই আসে নিখিল! যদি বাইরের দিকে কাউকে না দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যায়! দূত পাঠিয়ে যে নিমন্ত্রণ করতে পেরেছে, সে যে অভ্যর্থনার খাতিরে এক-পা এগিয়ে আসতে পারবেনা এ কথা কি বিশ্বাস করবে সে!

মণি কি করে জানিয়ে দেবে এ নির্ব্বাসন তার স্বেচ্ছাকৃত নয়! একবারটি এক মিনিটের জন্যে যদি বাইরের ঘরটা ঘুরে আসতে পেতো সে, নিখিল আসছে কিনা দেখতে!

—সুকল্যাণীদি, আজ আর পড়তে পাচ্ছি না, বড়ো মাথা ধরেছে।

মাথাটা কে ধরেছে সেটা অনুমান করতে দেরী হয়না সুকল্যাণীর। অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছে ছাত্রীর চঞ্চল অস্থিরতা। সামান্য হেসে বলে—মাথা ধরা আশ্চর্য্য নয়, সারাদিন 'হল' এর গরমে! অবিশ্যি পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেলে—আর বেশী না পড়াই ভালো, তা'তে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। যাও বরং খোলা ছাদে চলে গিয়ে একটু হাওয়া লাগাওগে। আমি উঠি। তা'ছাড়া—আমার একটু দরকার ছিলো—

সহসা তরুবালা জাঁতির শব্দ থামিয়ে ভারীগলায় গম্‌গম্ করে ওঠেন—দরকার মানে তো পার্কের বেঞ্চিতে বসে ওই রাঙামুলোর সঙ্গে গালগল্প করা? সে খবর আমি পেয়েছি।

সুকল্যাণী অবাক বিস্ময়ে বলে—কার কথা বলছেন মাসীমা? কিসের খবর পেয়েছেন?

—সে আর বিশদ করে বলতে হবে কেন বাপু, মনে মনে কি আর না বুঝেছো? এখানে সুবিধে হয় না, তাই পার্কে গিয়ে আড্ডা জমাও—এ আমার শুনতে বাকী নেই। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—দেখতে ভালমানুষটি হলেও ছেলেটির স্বভাব ভালো নয়। তা'ছাড়া—ওর

বাবা পাঁচ সাত লাখ টাকার মালিক, জমিদারের ছেলে, ওর কাছে কিছু আশা করতে যেওনা।

সুকল্যাণী স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলে—আমি তো আপনার কথা বুঝতে পারছিনা মাসীমা ?

—জেগে যে ঘুমোয়, তার ঘুম ভাঙানো শক্ত—তরুবালা আবার একটা সুপুরিকে জাঁতির "জাঁতিকলে" পুরে দু'খণ্ড করতে করতে বলেন—স্পষ্ট করেই বলি, এই নিখিলের কথাই বলছি, তাকে ধরতে যাওয়া তোমার পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাওয়া।

সুকল্যাণী আরক্তমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, কম্পিতকণ্ঠে বলে—ছি ছি, কাকে কি বলছেন আপনি ? সমস্ত সংসারটাকে আপনার নিজের মন দিয়ে বিচার করতে যাবেন না।

তরুবালা একটি বিষ-তিক্ত হাসি হেসে বলেন—তা' কোন স্বর্গ থেকে আর মন ধার করতে যাবো বলো ? তবে তোমার বিষয়ে অনেক কথাই জেনেছি কি না, তাই ভক্তি বিশ্বাস আর রাখতে পাচ্ছিনে।

সুকল্যাণী স্খলিতকণ্ঠে বলে—আমার বিষয়ে ? কি শুনলেন হঠাৎ ?

—সব কথা বলে লাভ নেই, তবে বুকে হাত দিয়ে বলো দিকিন, তুমি এখানে নাম ভাঁড়িয়ে পড়াতে এসেছো কিনা ? তোমার নাম সুকল্যাণী না কল্যাণী ?···আমরা বলি—বুঝি আইবুড়ো। ও মা একবারের বিধবা, আবার কোন "সেবাশ্রম" না কি মুণ্ডু আশ্রমে গিয়ে তার কর্তার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করে, বিয়ে করে, আবার পালিয়ে এসে এই করে বেড়াচ্ছো ! জগতে আর কাউকে বিশ্বাস নেই ! যাক্‌গে, তোমার যা খুসী করোগে, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু কথাটা যখন উঠলোই তখন চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে বলি—কাল থেকে আর এসোনা তুমি।

—এখন যে ওর পরীক্ষা চলছে মাসীমা···

প্রায় আর্তস্বরে কথাটা উচ্চারণ করে সুকল্যাণী।

—সে আমি বুঝবো। আমার মেয়ের ভালোমন্দ বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে।

—আচ্ছা—বলে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করে চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সুকল্যাণী। স্থিরস্বরে বলে—একটা কথা মনে রাখবেন মাসীমা, নিখিলবাবু আমার বিশেষ স্নেহভাজন আত্মীয়—বলে ধীরে ধীরে চলে যায়। বোধহয় ছাত্রছাত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখবার খেয়াল থাকে না।

ছাত্রটি যদি বা অশ্রুসজল চক্ষুকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পরিণত করে এবং আর একটু বড়ো হ'লে মাকে কিভাবে "দেখে নেবে" তার কল্পনা করতে গিয়ে এ অবহেলার জ্বালাটা ভোলে, ছাত্রী বেচারী পারেনা। টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে প্রচলিত ভাষায় যাকে "হাপুস নয়নে" বলে, সেই পদ্ধতিতে কাঁদতে বসে।

ছোট্ট মণির জন্যে ভগবানের এতগুলো কঠোর আয়োজন কেন? কেন আর সকলের মার মতো মা নয় তার? কেন তাদের ক্লাশের আর সব মেয়ের মতো ম্যাট্রিক পরীক্ষার মতো তুচ্ছ চিন্তাটাই একমাত্র চিন্তা হয়ে রইলো না তার? কেন সে আপনহৃদয়ভারে কম্পিত কাতর? অপরাধের বোঝায় পীড়িত?

আর কেনই বা সুকল্যাণীদির মতো এমন মমতাময়ীর স্নেহস্পর্শ তার ভাগ্যে বেশীদিন সইলো না?

সবটাই মণির ভাগ্যের দোষ?

কিন্তু নিখিলেরও কি দোষ নেই? সে কেন তুচ্ছ মণিকে ভালোবাসতে এলো? মণি কি জানতো ভালবাসা কি? ভালোবাসার বেদনা কি?

চাকরী গেল, তবু খুব বেশী দুঃখ হচ্ছেনা তো! কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবে—অকারণে মনটা এত হাল্কা হয়ে গেল কেন? মণির মার অতবড় অপমানের কথাও গায়ে লাগলো কই? বরং হাসি পাচ্ছিলো এই ভেবে লোকে কেমন করে জানবে কি সম্পর্ক তার নিখিলের সঙ্গে! অভিমান করে চলে এসেছে বলেই না কল্যাণী অজ্ঞাত অপরিচিত!

যে সংসারে আশ্রয় পেয়েছিলো—সে আশ্রয় যদি আঁকড়ে ধরতে পারতো! স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে না গিয়ে ডুবে যেতে পারতো জলের তলায়, সকলের মাঝখানে রাখতে পারতো নিজের জায়গা।

দেবতা না হয় নিজের পাষাণভার নিয়ে সরেই থাকতেন, এদের তো সে পেতে পারতো! তরুণ কন্দর্পের মতো সোনার ছেলেটি সখের খাতিরেও একবার ছোট্ট মা'টীকে 'মা' বলে ডাকতো না কি? জগতের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ডাক!

হয়তো আগে দেখা হলে কল্যাণীর জীবনের ইতিহাস যেতো বদলে।

প্রায় সমবয়সী এই ছেলেটিকে যুবক বলে সমীহ আসেনা, ছোটর মতো করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে—সে কি বিভূতিবাবুর আত্মজ বলেই? ওর নূতন প্রেমের আলোয় ঝলসে ওঠা তরুণ মুখের দীপ্তিতে কল্যাণীর জমাট বাঁধা বুকটা যেন হালকা হয়ে আসে, চিরদিনের গম্ভীর স্বভাব চঞ্চল হয়ে ওঠে আনন্দে!

"আমার ছেলে", "আমাদের ছেলে"—চুপিচুপি একবার উচ্চারণ করতে দোষ কি?

ভেঙ্গে যাওয়া ঘরকে আবার বাঁধতে ইচ্ছে করে কেন? এদের কাছে একটু ঠাঁই পাবার লোভ দুরন্ত হয়ে উঠছে যে!

আর মণির বিয়ের ঘটকালী?

সে ভার নিতেই হবে কল্যাণীকে। মানুষের অসাবধানে ভগবানের দেওয়া সম্পদটুকু নষ্ট হয়ে যেতে দেবে না।

মণির চিঠি !

মণি সকাতর অনুরোধ জানিয়েছে একটিবারের জন্যে আসতে।

কি করবে নিখিল ?

কি করে পারবে—না এসে থাকতে ?

সেদিন নয়, পরদিন মণিদের বাড়ী এলো। অবশ্যি শূলব্যথার ওষুধ নিয়ে নয়—এমনিই এলো।

মণি ম্লানমুখে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে বসে আছে, আর শ্রীমান মল্লিনাথ মাত্র একটুকরো কাগজের সাহায্যে কি করে দু'টো পালতোলা নৌকো গড়া যেতে পারে তারই এক্সপেরিমেণ্ট করছে। তরুবালা অনুপস্থিত।

—কই তোমাদের সুকল্যাণীদি আসেননি ? কর্ণধারহীন হয়ে বসে আছো যে ?

—"ইচ্ছে করলে আপনিও কর্ণধারণ করতে পারেন। সুকল্যাণীদি আর আসবেন না"—মল্লিনাথের টীকা।

কিন্তু মল্লিনাথের টীকায় নিখিলের বিশেষ জ্ঞান-সঞ্চার হ'লনা। বললে —আসবেন না ? অসুখ করেছে ?

—না, মা ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

—এই অসভ্য ছেলে, ওরকম বলতে আছে ?

মণির তাড়ায় কুণ্ঠিত মল্লি ব্যস্ত হয়ে ভ্রম সংশোধন করে নেয়—তাড়িয়ে দেননি, মানে—আসতে বারণ করে দিয়েছেন।

—কেন বলতো মণি ?

—জানিনা।

নিখিলের চোখের দিকে একটিবার চোখ তুলেই মুখ নামিয়ে নিলে মণি, আর ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো বইয়ের পাতার ওপর।

মল্লি যা বলে মিথ্যে নয়—"দিদিটা একটা ছিঁচ্‌ কাঁদুনে"। তাই নিজেই সে গম্ভীরভাবে বলে—রাগ! রাগ! আর কেন? দিদির এই পরীক্ষা চলছে—আর এখন মার এই রাগ ফলানো! কি যে হবে?

বিজ্ঞভাবে নিজের দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে মল্লিনাথ।

—হঠাৎ এত রাগের কারণ?

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো নিখিল, হঠাৎ পিছন থেকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন তরুবালা। যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—কারণটা তুমিই কি আর কিছু জানোনা বাছা? তবে যদি জেনেশুনে ন্যাকা সাজো!

—কি বলছেন মাসীমা?

নিখিল উত্তেজনার মুখে উঠে দাঁড়ায়।

—বোসো, উঠোনা, দু'চারটে কথা বলবো—তোমার বাপ জমিদার, তুমি যা খুসী করে বেড়াতে পারো, কিন্তু আমার মেয়ে তো তা নয়? ওকে গেরস্থঘরের বৌ হয়ে সংসার করতে হবে। এটা তো বোঝো?

নিখিল অবাক হয়ে বলে—তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

—না থাকলে কি আর বলছি? তবে বারণ করে দিচ্ছি—তুমি আর 'মণি' 'মণি' করে আদিখ্যেতা করতে এসোনা। মণি আর ছোটটি নেই!

লজ্জায় অপমানে সর্ব্বশরীর 'রি রি' করে উঠলেও সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে নিখিল ধীরস্বরে বলে—আর আমি যদি মণিকে আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিই মাসীমা?

—থাক্ বাবা, ওসব নভেলি কথা শুনে গলে যাবার মেয়ে আমি নই। তুমি আজ আমার মেয়েকে চাইবে, কাল তার মাষ্টারনীর সঙ্গে ভাব করতে যাবে—তোমার ধরণধারণ বুঝতে বাকী নেই আমার।

তরুবালার উত্তেজনা দেখে মনে হয় মণির সঙ্গে প্রেম করাটা যদি বা একদিনও বরদাস্ত করতে পারতেন, ওর মাষ্টারনীর সম্বন্ধে সন্দেহে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

আশা করবার যে কিছুই আর থাকছে না!

নিখিল কিন্তু চমৎকার মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্তভাবেই বলে—আপনি বড্ড ভুল ধারণা করে ফেলেছেন মাসীমা, ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—করো ভালই করো। কিন্তু তোমাদের—এখনকার ছেলেদের—ছেদ্দাভক্তি ভালবাসা কিছুতেই আমার রুচি নেই। তুমি বলছো "শ্রদ্ধা করি", তিনি বললেন "নিখিলবাবু আমার বিশেষ আত্মীয়"। আত্মীয়তা হঠাৎ গজালো? কতোই শুনবো!

—নিখিলবাবু, এখনো আপনি শুনছেন বসে বসে? যান, এখুনি চলে যান, যান শিগগির...

মণির অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উপস্থিত তিনজনেই চমকে ওঠে।

—লজ্জার কথা বলছো মা? লজ্জা কি তোমারই আছে? বয়সে বড় হলেই ছোটদের যা খুশী বলা যায়—তাই না? কিন্তু জেনো পৃথিবীতে সকলেই তোমার মতো নয়!

ছুটে চলে গিয়ে পাশের ঘরে উপুড় হয়ে পড়া ছাড়া আর কি করতে পারে অতটুকু মণি?

নিতান্ত মরিয়া হয়েই না এত কথা কইতে হ'ল তাকে!

নিখিল যখন পথে বেরিয়ে পড়লো তখন যেন মাতালের মতো টলছে। দু'টো অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনা বইবে কেমন করে? মণি! মণিকে আর দেখতে পাবেনা? তরুবালার অসঙ্গত খেয়ালের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে? যদি বা নিখিল সইতে পারে, মণি সইবে কি করে?

হয়তো দুর্ভাষিণী মার কাছে কতোই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। কিন্তু নিখিল কি তাকে এই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে চুপ করে থাকবে? নিজের মানের হিসেবটাই এতো বড় হয়ে উঠবে? আহা বেচারা মণি! ওকে উদ্ধার করতেই হবে তরুবালার কবল থেকে।

মোড়ের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল—মল্লিনাথ আসছে হাঁপাতে হাঁপাতে। তার হাতে দু'খানা মলাট ছেঁড়া ইংরেজী পত্রিকা।

—নিখিলবাবু, আপনার এই বই দু'টো—

বই দু'টো দেখে হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারেনা নিখিল। এই "ইলাষ্ট্রেটেড্ উইক্‌লি" দু'খানা বোধহয় মাস ছয়েক আগে সুরেশবাবুকে দিয়েছিল নিখিল, কেন তা' আর মনে নেই। পড়া হ'লে ফেরৎ নেবে এমন দুঃস্থ কল্পনা ছিলো না।

সেই বই দু'টো ফেরৎ দিতে এসেছে মল্লিনাথ!

সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে?

না। মল্লিনাথের কথা শুনেই বোঝা গেলো—বই দু'টো ছুতো মাত্র, মণির দূত হয়ে এসেছে সে।

—নিখিলবাবু, সুকল্যাণীদির সঙ্গে আপনার দেখা হয় তো? তা' এবার যখন দেখা হবে, আমাদের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

এতো দ্রুত কথা বলে মল্লিনাথ, যে তা'র কথার মাঝখানে প্রশ্নের চেষ্টা বৃথা।

ওর কথা শেষ হলে নিখিল অবাক হয়ে বলে—আমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে তোমার সুকল্যাণীদির?

শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে মল্লিনাথ বলে—কেন, পার্কে?

—পার্কে? নিখিল বিরক্ত হয়ে বলে—সে কবে একদিন দেখা হয়েছিল, তাই বলে রোজ হবে? আর দেখা হয়েছিলো সে কথা কে বললে?

—কে আবার বলবে? মা, মা! মা যে কোথা থেকে কি খবর পান? ওই জন্যেই তো মার সুকল্যাণীদির ওপর অতো রাগ।

—পার্কে যাওয়ার জন্যে রাগ?

—পার্কে যাওয়ার জন্যে, ছদ্মবেশের জন্যে!

—ছদ্মবেশের জন্যে!—নিখিল যেন ওর কথাবার্ত্তায় চমৎকৃত হয়ে যায়।...ছদ্মবেশ মানে কি?...

—ওই যে—কথার দ্রুতভঙ্গী ত্যাগ করে এবার আত্মস্থ ভাব গ্রহণ করে মল্লিনাথ—সুকল্যাণীদির আসল নাম তো সুকল্যাণী নয়, শুধুই কল্যাণী! তা'ছাড়া—উনি ঘোষও নয়, কল্যাণী লাহিড়ী।...মা তো তাই জন্যেই বলছিলেন—"আগে—উনি বিধবা ছিলেন, তারপর সধবা হয়েছিলেন, এখন আবার আইবুড়ো হয়েছেন! কি জানি আবার কবে সধবা হয়ে বসেন!" তা'—এইগুলো তো ভালো নয়?

মল্লিনাথের পরবর্ত্তী কথাগুলো আর মনে ঢোকেনা নিখিলের, ওর মাথার মধ্যে যেন ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজতে থাকে—কল্যাণী লাহিড়ী! কল্যাণী লাহিড়ী!

এ কোন নাম? এ কার নাম? একি কেবলমাত্র একটা আশ্চর্য্য সমাবেশ মাত্র?

দ্রুত স্পন্দিত বক্ষে নিখিল বলে—তুমি ওঁর ঠিকানা জানো?

—না তো!

—কেউ জানো না? তুমি? দিদি? মেসোমশাই?

—তা'তো জানি না! জিগ্যেস করে আসবো?

—জিগ্যেস করবে? কা'কে?

—দিদিকে, কি মাকে?

নিখিল অন্যমনাভাবে বলে—না। থাকগে।...নাঃ, এভাবে খোঁজ

খবর করতে গিয়ে গোলমালের স্থষ্টি করে লাভ কি? বরং কোর্টে গিয়ে স্থরেশবাবুর কাছে জেনে এলে হয়। কিন্তু জেনে কি সত্যিই কিছু লাভ হবে?

জীবনটা কি রূপকথা?

কিন্তু কল্যাণী লাহিড়ী।

মণির চিন্তা ভেসে গেলো এই নতুন জোয়ারে।

মল্লিনাথকে যা হয় একটা কথায় বিদায় দিয়ে ফিরে চললো অন্য পথে।

দেশ থেকে ফিরে এসে যদিও নিখিল অহরহই বাবার কাছের প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করেছে, কিন্তু কিভাবে যে খুঁজতে হবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলো না, এতোদিনে তবু খোঁজারও একটা দিক খোলা পেলো। অসম্ভব সম্ভব হয় না সত্যি, তবু এই মিথ্যে আশায় ডুবে মনকেও তো খানিক ব্যাপৃত রাখা যায়।

কে জানে, একেবারেই কি অসম্ভব ?

কেন তবে মণি মল্লির শিক্ষয়িত্রীকে দেখে নিখিল অমন একটা স্নিগ্ধ আকর্ষণ অনুভব করেছে ? কোনো একদিন বিভূতি লাহিড়ীর সঙ্গে সুকল্যাণীর সম্পর্ক-সূত্র গাঁথা হয়েছিলো বলে ?

তা জীবনটা যে সত্যিই রূপকথার মতো লাগছে !

নিখিলের বিধাতা কি একজন কৌতুকপ্রিয় ঔপন্যাসিক ? তাই তাঁর রচনায় ঘটনাচক্রের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ ? সুদুর্লভ আকাঙ্খিত বস্তুকে কে কবে পেয়েছে এমন অপ্রত্যাশিত মহিমায় ? জীবন উপন্যাসে এমন অসাধারণ ঘটনাচক্র ঘটে ?

সুরেশবাবুর কাছ থেকে তাঁর বন্ধুর ঠিকানা, এবং তাঁর কাছ থেকে তস্য বন্ধুর, অনেক দরজায় ধর্ণা দিয়ে কল্যাণীর ঠিকানা সংগ্রহ করেছে, সংগ্রহ করেছে তার জীবন ইতিহাস। সংগ্রহ করে তবে এসেছে—আগে আসেনি !

অনেক অসম্বরণীয় ইচ্ছেকে সম্বরণ করে রেখেছে ক'দিন। এসে কি বলবে ? কোন দুঃসাহসিক প্রশ্নে সুকল্যাণীর কাছ থেকে সংগ্রহ করবে কল্যাণীর জীবন ইতিহাস ?

একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে যাওয়াই ভালো। যদি নিখিলের

সৃষ্টিছাড়া আশাটা নিখিলকে তীব্র ব্যঙ্গ করে চলে যায়, তবে কি লাভ সুকল্যাণী ঘোষকে খুঁজে বার করে দেখবার ?

অসম্ভব আশা যদি সত্যিই সম্ভব হয়, তবেই গিয়ে সামনে দাঁড়াবে। দাঁড়াবে দাবী নিয়ে।

অনুনয় নয়, অনুরোধ নয়, পরিষ্কার দাবী !

নিখিলের মা নিখিলের কাছে ছাড়া অন্যত্র থাকবে কেন ?···যে যা বলে বলুক, নিখিল কেয়ার করে না।

হঁ্যা, সংগ্রহ হয়েছে ইতিহাস।

কল্যাণী লাহিড়ীই বটে।

মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ বিভূতি লাহিড়ীর স্ত্রী।

ঠিকানা দেখে এসে তো হাজির হলো নিখিল, কিন্তু বাড়ী দেখে যে বিশ্বাস হয় না।

এতোবড়ো লোহার ফটক-ওলা, গ্যারেজ বসানো প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীখানা যে কল্যাণীর বাসস্থান হ'তে পারে এটা বিশ্বাস করা শক্ত।

হয়তো ধনী আত্মীয়ের বাড়ীতে একটু আশ্রয় নিয়ে আছে।

আজই নিয়ে যাবে নিখিল কল্যাণীকে তার নিজের আশ্রয়ে। গৌরবের আর দাবীর আসনে। যেখান থেকে নিখিল পাবে আশ্রয়।···হয় তো আশ্রয় দিতে পারবে বিভূতি লাহিড়ীকেও।

বাবার কাছে এইবার বড়ো মুখ করে দাঁড়াতে পারবে নিখিল।

ফটকের কাছে ঘোরাঘুরি করাটা অবশ্য ভদ্রতা নয়। এসব জায়গায় কার্ড পাঠিয়ে দিলেই মানায় ভালো। কিন্তু বড়োলোকের ছেলের মতন চাল-চলন কিছুই যে শেখেনি ছেলেটা ! যতোই হোক মেদিনীপুরী বৈ তো নয় !

দেশ থেকে ফিরে এসে যদিও নিখিল অহরহই বাবার কাছের প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করেছে, কিন্তু কিভাবে যে খুঁজতে হবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলো না, এতোদিনে তবু খোঁজারও একটা দিক খোলা পেলো। অসম্ভব সম্ভব হয় না সত্যি, তবু এই মিথ্যে আশায় ডুবে মনকেও তো খানিক ব্যাপৃত রাখা যায়।

কে জানে, একেবারেই কি অসম্ভব?

কেন তবে মণি মল্লির শিক্ষয়িত্রীকে দেখে নিখিল অমন একটা স্নিগ্ধ আকর্ষণ অনুভব করেছে? কোনো একদিন বিভূতি লাহিড়ীর সঙ্গে সুকল্যাণীর সম্পর্ক-সূত্র গাঁথা হয়েছিলো বলে?

তা জীবনটা যে সত্যিই রূপকথার মতো লাগছে!

নিখিলের বিধাতা কি একজন কৌতুকপ্রিয় ঔপন্যাসিক? তাই তাঁর রচনায় ঘটনাচক্রের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ? সুদুর্লভ আকাঙ্খিত বস্তুকে কে কবে পেয়েছে এমন অপ্রত্যাশিত মহিমায়? জীবন উপন্যাসে এমন অসাধারণ ঘটনাচক্র ঘটে?

সুরেশবাবুর কাছ থেকে তাঁর বন্ধুর ঠিকানা, এবং তাঁর কাছ থেকে তস্য বন্ধুর, অনেক দরজায় ধর্ণা দিয়ে কল্যাণীর ঠিকানা সংগ্রহ করেছে, সংগ্রহ করেছে তার জীবন ইতিহাস। সংগ্রহ করে তবে এসেছে—আগে আসেনি!

অনেক অসম্বরণীয় ইচ্ছেকে সম্বরণ করে রেখেছে ক'দিন। এসে কি বলবে? কোন দুঃসাহসিক প্রশ্নে সুকল্যাণীর কাছ থেকে সংগ্রহ করবে কল্যাণীর জীবন ইতিহাস?

একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে যাওয়াই ভালো। যদি নিখিলের

সৃষ্টিছাড়া আশাটা নিখিলকে তীব্র ব্যঙ্গ করে চলে যায়, তবে কি লাভ সুকল্যাণী ঘোষকে খুঁজে বার করে দেখবার ?

অসম্ভব আশা যদি সত্যিই সম্ভব হয়, তবেই গিয়ে সামনে দাঁড়াবে। দাঁড়াবে দাবী নিয়ে।

অনুনয় নয়, অনুরোধ নয়, পরিষ্কার দাবী !

নিখিলের মা নিখিলের কাছে ছাড়া অন্যত্র থাকবে কেন ?···যে যা বলে বলুক, নিখিল কেয়ার করে না।

হ্যাঁ, সংগ্রহ হয়েছে ইতিহাস।

কল্যাণী লাহিড়ীই বটে।

মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ বিভূতি লাহিড়ীর স্ত্রী।

ঠিকানা দেখে এসে তো হাজির হলো নিখিল, কিন্তু বাড়ী দেখে যে বিশ্বাস হয় না।

এতোবড়ো লোহার ফটক-ওলা, গ্যারেজ বসানো প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীখানা যে কল্যাণীর বাসস্থান হ'তে পারে এটা বিশ্বাস করা শক্ত।

হয়তো ধনী আত্মীয়ের বাড়ীতে একটু আশ্রয় নিয়ে আছে।

আজই নিয়ে যাবে নিখিল কল্যাণীকে তার নিজের আশ্রয়ে। গৌরবের আর দাবীর আসনে। যেখান থেকে নিখিল পাবে আশ্রয়।···হয় তো আশ্রয় দিতে পারবে বিভূতি লাহিড়ীকেও।

বাবার কাছে এইবার বড়ো মুখ করে দাঁড়াতে পারবে নিখিল।

ফটকের কাছে ঘোরাঘুরি করাটা অবশ্য ভদ্রতা নয়। এসব জায়গায় কার্ড পাঠিয়ে দিলেই মানায় ভালো। কিন্তু বড়োলোকের ছেলের মতন চাল-চলন কিছুই যে শেখেনি ছেলেটা ! যতোই হোক মেদিনীপুরী বৈ তো নয় !

এক টুকরো কাগজে নিজের নাম লিখে, ছোকরা একটা চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলো ভিতরে। তার একটু পরেই কল্যাণী এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলো। নিঃসঙ্কোচেই এলো।

মণিদের বাড়ীতে তা'কে না দেখে, নিতান্তই খোঁজখবর নিতে এসেছে মাত্র! এ ছাড়া আর কিছু তো ভাবাও যায় না।

খুব ভাগ্যি যে তরুবালা নিখিলের সামনে নিজের মনের গলদ প্রকাশ করে বসেননি।···নিশ্চয়ই না। নইলে কি নিখিল আসতে পারতো এমন হাসিমুখে?

তরুবালার ওপর সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধ করে কল্যাণী।

—কি খবর? ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছেন দেখছি। বসুন।

নিখিল একখানা চেয়ার দখল করে বসলো। বললো—আপনার খবর কি বলুন? কেমন আছেন?

—ভালোই। মণি কেমন পরীক্ষা দিলে?

—মণিই জানে।

—বাঃ! আপনি খবর রাখেন না?

—কই আর রাখলাম?

—কেন? যাননা না-কি আর?

শঙ্কিত প্রশ্ন করে কল্যাণী।···

—ঠিক তাই। যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন বলুন তো?

নিখিল বেশ গম্ভীর ভাবে বলে—মাসীমা বললেন—'মণি পড়া কামাই করে আড্ডা দেয়, আমি ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে ঢোকবার অনুপযুক্ত'—এই সব।

কথা বলার ধরণে কল্যাণী হেসে ফেলে।

—হাসছেন যে? আপনিই বুঝি বাদ আছেন? 'গেরস্থর মেয়ে বখিয়ে' দেওয়ার পাপে পাপী নন আপনি?

—আপনাদের মাসীমার মাথা খারাপ।

—মাথা মোটেই খারাপ নয়, বুঝলেন? খারাপ ওঁদের চোখ—অধিকাংশ মাসীপিসিরই। লোকে জণ্ডিস্ হ'লে যেমন যথাসর্ব্বস্ব হলদে দেখে, তেমনি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই মসীবর্ণ দেখছেন ওঁরা—চোখের কালিপড়া দৃষ্টি দিয়ে।

—মেয়ে-ছেলে দুটি কিন্তু ভারী চমৎকার, ভারী ভালো লাগে আমার। প্রতিদিন মন কেমন করে।

নিখিলের রসনায় প্রায় এসে গিয়েছিল—'আমারও।' খুব সামলে নিয়ে বলে—হ্যাঁ। এদিকে বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট্ আছে। তা'ছাড়া—

'তা'ছাড়া' দিয়ে কি বলবে ঠিক ভেবে উঠতে না পেরে নিখিল একটু থেমে যায়—আর সেই সুযোগে কল্যাণী ওর গম্ভীর স্বভাবের অন্তরালে লুকানো চাপা হাসিটুকু হেসে বলে—তা'ছাড়া ভারী সুন্দর। ওকে আমার ছেলের বৌ করে নেব ভাবছি।

—ভাবছেন না-কি? তা বেশ, কিন্তু সেই অনাগত সৌভাগ্যের আশায় মাথার চুলগুলো পাকিয়ে ফেলতে হবে তো বেচারা মণিকে।

—তা কেন? আমায় ভাবেন কি? দিব্যি উপযুক্ত ছেলে আছে আমার, দেখবেন যখন বিয়ে দেব, নেমন্তন্ন করবো।

—অনেক সৌভাগ্য আমার। কিন্তু তার আগে আমারও একটা মস্ত নেমন্তন্ন করবার আছে।

—কাকে?—কল্যাণী বিস্মিত প্রশ্ন করে—কিসের?

—তোমাকে! বৌ বরণ করে ঘরে তোলবার।

বড় বড় প্রশান্ত দুটি চোখ মুহূর্ত্তের জন্য একবার তুলে ধরেই নামিয়ে নেয় কল্যাণী।...পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেছে, যাক। নিখিলকে দূরে সরিয়ে রেখে

চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল কল্যাণীর পক্ষে।...নিখিল, মণি, এদের নিয়েই কি রচনা করা যায় না একটুখানি শান্তির নীড় ?...পাথরের দেবতা না হয় নাগালের বাইরে উঁচুতেই থাকলেন নিজের কাঠিন্য নিয়ে !...অসম্ভবের আশা আর করবে না কল্যাণী।

—চলো, তোমায় নিতে এসেছি।

—আচ্ছা পাগল তো ! যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে কল্যাণীর স্বর। 'নিতে এসেছি' কি ?

—বাঃ নিতে আসবো না ? বাবা বাউণ্ডুলে হয়ে তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন—মা রাজকন্যের মতন নিজের মান নিয়ে বসে থাকবেন—আর আমি বুঝি বানের জলে ভেসে যাবো ?...দেখে শুনে কে আমার বিয়ে দেবে শুনি ?

এর পরও কি স্থির থাকা যায় ?

বড় বড় চোখ তুটির কানায় কানায় উপছে ওঠে উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বন্যা। এত সম্মানের ভার বইবে কি করে কল্যাণী ? এর দাম দেবার মত ঐশ্বর্য্য তার আছে কি ?

হ্যারিসন রোডে নিখিলের নিজের বাসায় সকালবেলা দোতলার বারান্দায় নিখিল হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়েছিল—অদূরে কল্যাণী ষ্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়ে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করছিল। জল ফুটে গেলে নিখিলকে তাড়া দিয়ে বলে ওঠে—আবার তুমি শুয়ে পড়লে যে? চা হয়ে গেল কিন্তু!

—হ'তে দাওনা বাছা। কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে আমার শরীর খারাপ হ'লে কি তোমার চা দায়ী হবে?

—কাঁচা ঘুমই বটে? কল্যাণী হেসে ওঠে—সাতটা বেজে গেছে। ওঠ—ওঠ শিগগির।…এই করেছে মাটি, আবার পাশ ফিরছো? নাঃ জমিদারী চাল বটে!

—নাঃ তুমিও আমার বাবার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী বটে! এইটিই শিখে নিয়েছিলে বুঝি—নিখিল বেচারার বড় সাধের ঘুমটুকুর অকালমৃত্যু ঘটানো? এই ভোরবেলা এখন উঠতে হবে? বেশ ছিলাম বাবা, এই এক জ্বালাতন ইচ্ছে করে এনেছি—বলে হাসতে হাসতে উঠে পড়ে।

অদ্ভুত ছেলে! ওর সংস্পর্শে এসে কল্যাণীর রূক্ষ্ স্বভাব বদলে যাচ্ছে যেন।…কিন্তু এ যে বালুচরে বাসা বাঁধা! এর মূল কই? শিকড় কই? তাছাড়া সমাজই কি দাম দেবে ওদের নির্ম্মল ভালবাসার? ধরে বেঁধে নিয়ে তো এসেছে তাকে, কিন্তু থাকা চলবে কি করে? অথচ চলবে না সে কথাই বা বলবে কোন মুখে—এই শৈশব সারল্যে ভরা যুবকের কাছে?

তবু বলতেই হয়।

—আজ আমায় রেখে আসবে তো?

—রেখে? কোথায়?

—যেখান থেকে এনেছিলে।

—কি, তোমার সেই কণ্ঠিতেলকধারী দাদাটির কাছে? মুখে এনোনা মা জননী, মুখে এনোনা ও কথা। তাঁর সামনে যেতে হবে মনে করলে আমার পীলে-লিভার, লাংস-হার্ট, সমস্ত শিউরে ওঠে। উঃ। নেহাৎ নাকি প্রাণের দায় ছিল, তাই কাল বাঘের খাঁচায় ঢুকেছিলাম—আবার? কেটে ফেললেও না।

—খুব যে নিন্দে করা হচ্ছে আমার দাদার? কি করেছেন তোমার শুনি?

—করেছেন? কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চোরকে যা করে—জেরা—জেরা। বাপ্‌স্‌ সে কী জেরা, যেন ব্যারিষ্টার সাহেব! ভয় হচ্ছিল, জোচ্চোর বলে হাজতে পাঠিয়ে না দেন!

—বা রে, জেরা করবেন না? টপ করে আমাকে দিয়ে দেবেন, তুমি কে তার হিসেব নেবেন না?

—'আমি কে'? কপট গাম্ভীর্য্যে মুখটি ভারী করে মাথাটা চুলকে নিখিল বলে—তাই তো—"আমি কে?" ভাববার মতন কথা বটে! "রামপেসাদ" ভেবেছিল—শঙ্করাচার্য্য ঠাকুর ভেবেছিল—আর কে কে যেন ভেবেছিল বলো তো?···'আমি কে?'···নাঃ! ভাবিয়ে তুললে—

—বাবাঃ, তোমার সঙ্গে কথায় কে পারে?

—বোঝো তা' হলে? সেই আমি—তোমার দাদার সামনে যেন—বেতসপত্র। হাসতে যে কোনদিন শিখেছিলাম ভুলেই গেলাম সে কথা। মনে মনে খালি ওই কণ্ঠিদের ইষ্ট শ্রীকেষ্টর কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করেছি—হে ঠাকুর, আমার প্রাণে ভরসা দাও, আর বুড়োকে সুমতি দাও।···উঃ তাঁর কবল থেকে বেরিয়ে এসে বুকে হাত দিয়ে বার বার দেখলাম হার্টফেল করেছি কিনা! আবার যাবো সেখানে?

—তবে আমায় ছেড়ে দাও? একলাই যাই?

—খালি যাই-যাই করছো কেন বলতে পারো? ছেলেকে একবেলা এক পেয়ালা চা খাইয়েই কর্ত্তব্য সাঙ্গ হ'ল? ভালো, ভালো। হবে না কেন? সৎমা বৈতো নয়?…আজ আমার নিজের মা থাকলে? এবেলা ওবেলা 'কনে' দেখে বেড়াতো।

—হরি বল। সেই খেদ?—কল্যাণী হেসে ফেলে।—তা' সত্যি—চল ওবেলা গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসি, বড় মন কেমন করছে। আর কথা-বার্ত্তাও কইতে হবে তো? তাঁরা তো মেয়ে নিয়ে আর মান নিয়ে বসে থাকবেনা?

—আমি যেতে-টেতে পারবো না বাবা!

—আমি একলা যাবো নাকি? বাবা! তোমার মাসীমাটির কাছে একলা যেতে সাহস হয় না আমার—

—ঠিক তোমার দাদার মতন! আমার মামা-মাসী ভাগ্যটাই দেখছি উৎকৃষ্ট। তোমার ওই দাদার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকো কি করে বলো তো?

—বাঃ যে বাড়ীতে জন্মালাম—

—উনি তোমার নিজের দাদা নাকি?

—কেন, বিশ্বাস হয় না?

—বিশ্বাসযোগ্য নয় বটে—ও বাড়ীটা তা'হলে তোমার বাবার?

—আগে ছিল। এখন দাদার।

—তা' জানি। কিন্তু এত বড়লোকের মেয়ে হয়ে তুমি সেবাশ্রমে চাকরী নিতে গিয়েছিলে কেন বলো তো? দাদার সঙ্গে বনতো না বোধ হয়?

—বনাবনি আর কি? বিয়ে দিয়েই বাবা মারা গেলেন। তারপরই দুর্ভাগ্য নিয়ে ফিরে এলাম দাদা-বৌদির কাছে। বৌদি উঠে পড়ে লাগলেন আমাকে মোক্ষপথে এগিয়ে দিতে।…কৃচ্ছসাধনের ঠ্যালায় দমবন্ধ হবার জোগাড়! একাহার সহ্য হয়, একবস্ত্র সওয়া সোজা নয়। তার ওপর

মস্তকমুণ্ডনের হুকুম।···ভেতরে ভেতরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।···যেদিন বললেন—কাল গুরুদেব এসে 'কণ্ঠি' দেবেন, সেই রাত্রে নিজের পথ দেখলাম। ওঁরা তখন নতুন কৃষ্ণপ্রাপ্তির ভাবে বিভোর—দাদা-বৌদি, বৌদির বাপের বাড়ীসুদ্ধু লোক সব খোল করতালের আওয়াজে 'দশা' পাচ্ছেন। বাড়ীতে রোজ 'মচ্ছোব', কোন ফাঁক দিয়ে যে গলে বেরিয়ে গেলাম কেউ টেরও পেলে না।···কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক। গিয়ে উঠলাম সেবাশ্রমে, সেখান থেকে খবর দিলাম।

কল্যাণীকে চুপ করতে দেখে নিখিল বলে—চিঠি পেয়ে ফিরে আসতে বললেন না যে বড় ?

—না লিখলেন—'যে মেয়ে এমন পুণ্যের আবহাওয়া ছেড়ে পাপের পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই আমাদের।'

—আবার তুমি সেই দাদার কাছে এলে ?

—এলাম বৈ কি, তবু তো দাদা! চুপি চুপি বললেন—'এসেছিস বেশ করেছিস, তোর বৌদির দিকে বেশী যাসনে, ভারী ক্ষেপে আছে।' ক্ষেপে তো ছিলেনই, তার ওপর আবার মাথায় সিঁদুর।

কল্যাণী একটু হেসে চুপ করলো।

এই সামান্য হাসিটুকুর মধ্যে ধরা পড়লো অনেক লাঞ্ছনা বেদনার প্রচ্ছন্ন ইতিহাস।

—মেয়েমানুষ মেয়েমানুষকে যত কষ্ট দিতে পারে, এমন বোধকরি কেউ পারে না, কি বল ?

—যার যা ভাগ্য নিখিল! শৈলদির মতন মেয়েও তো আছে সংসারে।

—তাই জন্যেই এখনো টিঁকে আছে সংসার।···সত্যি, শৈলদিকে দেখতে ইচ্ছা করছে। এখানের ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে আমরা সকলে মিলে একবার আশ্রমে যাবো, কেমন ?

নিখিল ও কল্যাণীকে তাড়ানোর পর সুরেশবাবুর কাছে অনেক তিরস্কার হজম করে রীতিমত অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন তরুবালা। সত্যি, নিখিলের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করা উচিত হয়নি তাঁর। সে তো মুখ ফুটে বিবাহের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করেছিল, কি যে অদ্ভুত ঈর্ষার জ্বালায় ছটফট করলেন তখন? গোপন মনের অন্তরালে যে আকাশকুসুম রচনা করেছিলেন, কল্যাণীকে তার প্রতিবন্ধক ভেবেই না অত জ্বালা ধরেছিল তখন?···ভেতরে যে এত ব্যাপার কে জানে বাবা!

ভালমানুষ তরুবালা কি করেই বা জানবেন মাষ্টারনীটা আবার ওর সৎমা! বনাবনতি যদি নাই হবে, তবে আর দ্বিতীয় পক্ষে বিয়েই বা করা কেন নিখিলের বাপের? অত বড় ছেলে থাকতে? জমিদারগিন্নী এলেন—টিউশনী করতে!—কালে কালে কত ফ্যাসানই হবে। একটু এদিক ওদিক হলেই মানুষ যদি আপনার লোকের সঙ্গে সম্পর্কের 'কাটান ছেঁড়ান' করে, তাহলে তো আর পৃথিবী চলে না।···নির্জীব দুটো ঘটি বাটিও কাছাকাছি থাকলে ঠোকাঠুকি হয়—আর এতো দুটো জলজ্যান্ত মানুষ! ঠোকাঠুকি হবে না? তাই বলে তেজ করে চলে এসে মাষ্টারী করে খেতে হবে?···তবে হ্যাঁ, তেজী মেয়েমানুষের স্বভাব-চরিত্তির মন্দ হয় না। সে কথা সত্যি।

স্বামীর সঙ্গে বেশী আর ঝগড়া করেন না তরুবালা, মণির ম্লান মুখের পানে চেয়ে নিজের দোষটা যেন কিছু হৃদয়ঙ্গম করেন। থাকৃগে সৎ-শাশুড়ী, তবু তো মণি রাজরাণী হতে পারতো। তাছাড়া—মেয়ের মন পড়েছিল।

এখন—শত চেষ্টাতেই কি অমন ঘর বর জোটাতে পারবেন?

এমনি মনের অবস্থায় হঠাৎ একদিন আশাতীতভাবে কল্যাণী আর নিখিলের আবির্ভাব।

—আপনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তবু এলাম মাসীমা।—নিখিল হেঁট হয়ে প্রণাম করলো।

—আর লজ্জা দিওনা বাবা। মাথার বেঠিকে কা'কে কি বলে বসেছি সেই থেকে লজ্জায় মরে আছি।

কল্যাণী এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললে—তার শাস্তি স্বরূপ আপনার মেয়েটিকে আমরা 'মায়ে পোয়ে' বাজেয়াপ্ত করে নেব।

নিখিলের সঙ্গে মিশে বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে কল্যাণী। ঠাট্টা-তামাসাও শিখেছে।...ছেলেবেলা থেকে ভাগ্যের মার খেয়ে খেয়ে যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল ওর মনটা, আটাশ বছর বয়সেই এসে যাচ্ছিল মানসিক জরা।...ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে আবার।

হাত ধরে বসিয়ে তরুবালা বলেন—মণি তো তোমাদেরই ভাই, ওকে আমি আটকে রাখলে কি হবে—ওর মন পড়ে আছে তোমাদেরই কাছে।...

মল্লিনাথ ছুটে গিয়ে বলে—এই দিদি, ছুট্টে যা, নীচে যা, দেখগে কে এসেছে। ছুট্টে—ছুট্টে—শিগগির—

মণি হতভম্ব হয়ে হাতের সেলাইয়ের কাজটা হাতে করেই ছুটে নেমে এসে স্তম্ভিত। না পারে দাঁড়াতে, না পারে ফিরে যেতে।...আর দোতলার বারান্দা থেকে দুষ্টু মল্লির হুইস্লের মত তীক্ষ্ণ স্বর বেজে ওঠে—মা দেখছো দিদিটা কি বেহায়া হয়েছে? বললাম—তোর বর আর শাশুড়ী এসেছে, ছুটে দেখতে গেল?

বিভূতিবাবুর তীর্থভ্রমণটা প্রায় অজ্ঞাতবাসের মতই হয়ে উঠেছিল। কোথায় কদিন থাকেন তার স্থিরতা ছিল না বলে ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই নিখিলও পারেনি চিঠিপত্র দিতে। মাঝে একবার নৃপেনবাবুর কাছে খবর এসেছিল—'হরিদ্বারে আছি, কদিন থাকবো ঠিক নেই। আশ্রমের কিছু অভাব অভিযোগ থাকলে নিখিলকে জানাবেন, আর অর্থের প্রয়োজন হ'লে 'কাছারীবাড়ীতে' কারণ জানিয়ে লোক পাঠাবেন! এ বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে নায়েব হরিশঙ্কর আইচকে।' এইসব।

এইটুকু মাঝখানের খবর।

ছ'মাস পরে শৈলবালা পেলেন দীর্ঘ চিঠি।...লিখেছেন—"শৈল মাসি, ভেবেছিলাম তীর্থভ্রমণের ছুতোয় মনটাকে আবার গড়ে নেব...ভাঙা গড়া যখন সারা জগতের লীলা, তখন মানুষের মনই বা একবার ভাঙলে আবার গড়ে উঠতে পারবেনা কেন? দেখছি...পাকা বনেদ গড়বার মাল মশলা আলাদা। বিশ বছর ধরে নিজেকে শুধু প্রবঞ্চনা করে এসেছি, অবস্থার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি বলেই ধরা পড়েনি—কোথায় লুকোনো ছিল এত ফাঁকি এত দুর্ব্বলতা।...আজ দেখছি, সারাজীবন শুধু ছেলেখেলা করে এলাম।...তীর্থের পথে পথে, দেব মন্দিরের দরজায় দরজায় কল্যাণীর ছায়া দেখে চমকে উঠি, এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে বলতো? ছ'মাস ধরে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে শুধু এইটুকু উন্নতি করলাম শৈলমাসি, মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছি। শিখেছি জীবনকে সহজভাবে মেনে নেওয়াই মানুষের বড় কল্যাণ। লজ্জার বিকৃতিটাই বড় কথা নয়। হারিয়ে যাওয়া কল্যাণীকে যদি খুঁজে নাও পাই, খুঁজে বেড়াতে লজ্জা

পাবোনা আর।…নিখিল কি কোনো সন্ধানই পায়নি তার?…শিগগির ফিরছি, কলকাতায় নাববো নিখিলের বাসায়, তারপর যাবো বাড়ীতে মার কাছে।"

নিখিলের বাড়ীর সেই দোতলার বারান্দায় বসে কল্যাণী বঁটি পেতে ফল ছাড়াচ্ছিল। নিখিলের কে বিশিষ্ট বন্ধু আসবেন বিদেশ থেকে—তারই আয়োজন চলছে সারাদিন।...

নানা কাজে ব্যস্ত নিখিল...এতক্ষণে এসে বসেছে। একটা রেকাবীতে কিছু ফল-মিষ্টি সাজিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কল্যাণী হেসে বললে—তোমার অতিথি সৎকারের বহরটা ভালো। এই 'রেটে' সংসার করলে তোমাদের 'পেল্লায়' জমিদারীটি ছোট করে আনতে বেগ পাবেনা। ভেবে ভেবে রোগাই হয়ে গেলে দেখছি কাল থেকে।...

ঠাণ্ডা জলটা আগেই একটু খেয়ে নিয়ে জলের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে নিখিল আরামে 'আঃ' করে ফলের রেকাবীটা টেনে নিয়ে বসলো—কথা বললে না।

—কি গো বাবাঠাকুর, উত্তুর নেই কেন ?

—রোসো, আগে পেট ঠাণ্ডা করি।...হ্যাঁ, প্রশ্নটা কি যে উত্তুর দেব ?

—প্রশ্ন কিছুই নয়, তোমার সেই বিশিষ্ট বন্ধুটির চারখানা হাত আর দুখানা ডানা আছে কিনা তাই জিগ্যেস করছি। নরলোকের বন্ধু হ'লে লোকে তার আবির্ভাবের আশায় এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে না। বোধ করি দেবলোকের ?

নিখিল হেসে উঠে বলে—মা জননী যে আজকাল রীতিমত মানুষ হয়ে উঠছো দেখছি—উঃ আমিই মাঝে মাঝে কথায় হেরে যাই। আগে কিন্তু বড্ড 'হাঁড়িমুখী' ছিলে বাপু!

—কথা কি আর অমনি শিখেছি ? তোমার জ্বালায়! এর পর আবার তর্কচূড়ামণির পাল্লায় পড়তে হবে। সে এক অদ্ভুত মেয়ে, আছে তো

আছে, এক এক সময় এমন চুপ যেন বোবা মেয়ে, আবার কথা ধরলে রক্ষে থাকবে না। কত কথা কত প্রশ্ন···কোনো কথা লুকিয়ে রাখবার জো নেই ওর কাছে।

—ভাগ্যিস নেই! না হলে কি হ'ত বলতো? কিন্তু তুমিও আশ্চর্য্য মেয়ে! কি করে আমাকে চিনেও পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলে তাই ভাবি।

—আর ভাবতে হবে না।···এখন ভাবো দিকিন সুরেশবাবু বিয়ের তারিখ করতে এত দেরী করছেন কেন? পাঁজী কি আজকাল বিয়ে বয়কট্ করেছে নাকি?

—বাঃ মেয়ে! বিয়ে করলেই হ'ল? বাবা আসুন আগে?

—কে আসুন?—আচমকা চমকে ওঠে কল্যাণী।

—বাবা। আমার পিতাঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ লাহিড়ী। চেনোনা বুঝি তাঁকে?

—চিনতে আর পারলাম কই? কিন্তু সত্যিই কি তাঁর এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে?

—রীতিমত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলে যে দেখছি—সম্ভাবনা নেই মানে? তুমি কি আশা করছিলে বাবা আমায় ত্যজ্যপুত্তুর করেছেন? তা ভাববে বৈ কি, 'সুরুচি' জননী কিনা। ও আশা ছাড়ো মা-লক্ষ্মী, এ ধ্রুব পুত্তুরটিকে তিনি ত্যাগ করতে রাজী হবেন না।

—আহা আমি যেন তাই বলছি!—কল্যাণী বড় বেশী মিইয়ে পড়ে—কিন্তু তিনি আসার আগে আমায় পাঠিয়ে দিও লক্ষ্মীটি!

—কোথায়? তোমার সেই কণ্ঠিধারী দাদাটির কাছে?

—তা' ছাড়া আর কোথায়?

—কেন আমার বাবা কি পুলিশের দারোগা? আর তুমি দাগী আসামী? আসবেন শুনে হাত-পা এলিয়ে এল?

—আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝবে না নিখিল। দিব্যি করো আমার কাছে, তাঁর আসার সম্ভাবনা দেখলেই আমায় পাঠিয়ে দেবে।

কল্যাণীর ব্যাকুল স্বর নিখিলের সহজ পরিহাসপ্রবণ চিত্তে আঘাত দিয়ে মুহূর্তের জন্য গম্ভীর করে তোলে। ধীরস্বরে বলে—

—আচ্ছা, তোমরা—মেয়েরা—এত ভীরু, এত অক্ষম কেন বলতো? তোমার প্রাপ্য তুমি যদি সহজে না পাও, আদায় করে নেবার চেষ্টা না করে ফেলে ছড়িয়ে সরে দাঁড়াও কোন হিসেবে?

—আমার অক্ষমতা আমি স্বীকার করছি নিখিল।

—কিন্তু আমি যদি স্বীকার না করি? বৌ ছেলে নিয়ে সংসার করার সাধ তোমার হতে পারে—আমার বুঝি মেয়ে জামাই নিয়ে সংসার করার সাধ হয় না?

কল্যাণী কি উত্তর দেবে? এতবড় স্নেহকে অবহেলা করবে—এত বড়লোক তো সে নয়? স্নেহের সঞ্চয় কতটুকু আছে তার জীবনে?··· তবু···এ যে জীবন মরণের সমস্যা!···কল্যাণীর জীবনেই বা বারবার এত সমস্যা দেখা দেয় কেন?

বড় বড় চোখের কোল বেয়ে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে হাতের কাছে বঁটিটার ওপর।

—হয়েছে সরো, বঁটি ছাড়ো—শেষে হাত কেটে দুখানা করবে? মেয়েরা যে কেন এত ছিঁচকাঁদুনে হয় তাই ভাবি। ওঠ বাছা ওঠ। যেন ফাঁসির হুকুম হয়েছে ওনার।···যাক্‌গে ষ্টেশনে ফোন করে দিই—বাবা যেন এখানে এসে না ওঠেন···কিন্তু তারই কি সময় আছে? ত্রৈলোক্য গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে গেছে—সে তো দুঘণ্টা।

—ষ্টেশনে?···শুধু এইটুকু প্রশ্ন করতে পারে কল্যাণী।

—ষ্টেশনে নয় তো কি? হাওড়া ষ্টেশনে।

—তবে যে বললে তোমার বন্ধু ?

—ভুল বলেছি ? বাবা কি বন্ধু নয় ? দ্বিতীয়ভাগ পড়োনি বুঝি ? —"মাতা-পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধু—"।

—তা'হলে তাঁকেই আনতে গাড়ী গেছে ? এখুনি এসে পড়বেন ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কতবার বলবো ? বাংলা ভাষা ভুলে যাচ্ছো নাকি ?

—নিখিল, দোহাই তোমার, আমায় ক্ষমা করো।

নিখিল এবার সত্যিই গম্ভীর হয়ে যায়। কাছে সরে এসে ছোট মেয়ের মত কল্যাণীর মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে—অত ভয় পাচ্ছো কেন ? দেখো, দেখা হলেই সব সহজ হয়ে যাবে। শুধু একটু চক্ষুলজ্জা, শুধু একটু অভিমান, এর জন্যে এতবড় জীবনটা মাটি করবে কেন ? এতই সস্তা জিনিস এটা ? এতটুকু যদি জোর নেই, অতবড় মানুষটাকে ভালোবাসতে সাহস হ'ল কি করে ? তা যদি পেরেছো, তবে নিজের দাবী নিয়ে এগিয়ে যেও। বিভূতি লাহিড়ীর স্ত্রী বলে সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পাও, নিখিলের মা বলে দাঁড়িও। দেখবে কোথাও আটকাবে না।—বলেই হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের ভঙ্গীতে হেসে উঠে বলে—তখন হয়তো ছেলের বৌয়ের গয়না পছন্দ হ'লনা বলে, নয়তো রসুনচৌকী বাজলো না বলে, কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে লেগে যাবে আমার ভালমানুষ বাবাটির সঙ্গে।

কয়েক ফোঁটা অশ্রুতে আর কুলোয় না। রুদ্ধ বন্যার বেগ কূল ছাপিয়ে ওঠে।...নগণ্য কল্যাণী ! তাকে এত গৌরব এত মর্য্যাদা কেন দিতে এল নিখিল ? এই বিরাট স্নেহের দাবী ষোল আনা মেটাবার সাধ্য কি কল্যাণীর আছে ? এই দুরূহ সৌভাগ্য বইতে পারবে তো ?

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

—ওই এলেন বাবা…

গমনোন্মুখ নিখিল ঘুরে দাঁড়িয়ে কল্যাণীকে উদ্দেশ করে বলে—দেখ বাছা, আবার যেন পালিও না—বলে ছুটে নীচে নেমে যায়।

পালিয়ে যাবার পথ থাকলে নিখিলের কথা মানতো কি কল্যাণী? কিন্তু এটা শালবনীর বাগানবাড়ী নয়—কলকাতার সহরের চারখানা দেয়াল ঘেরা ইঁটের খাঁচায় ওই একটি মাত্র পথ, যে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন নিখিল আর বিভূতিবাবু।

পৃথিবী দ্বিধা হ'ল না—কল্যাণী মন্ত্রবলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল না। অসম্ভব একটা—ভয়ঙ্কর একটা—কিছু ঘটবার পূর্ব্বেই বিভূতিবাবু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন উপরতলাটা অবাধ শূন্য ভেবেই।…ত্রৈলোক্যকে নিষেধ করা ছিল কল্যাণীর উপস্থিতি জানাতে।

উঠেই সিঁড়ির সামনে ফলের ঝুড়ি আর বঁটির সামনে নতমুখী স্ত্রীলোকটিকে দেখে দু'পা পিছিয়ে গেলেন বিভূতিবাবু। নিখিলের একক বাসায় স্ত্রীলোক! কেন?…দাসী? বেশের পরিচ্ছন্নতা তো সে কথা বলছে না? কে এ? কে?…নিখিল কি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে?…হারিয়ে যাওয়া পাখীকে ধরে এনে খাঁচায় পুরেছে?

এগুলেন আর এক পা।

ঠিক সেই সময়ে সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে দিয়ে কল্যাণী উঠে দাঁড়ালো!

—কল্যাণী—?

—হ্যাঁ আমিই। অবাক হচ্ছ?

—কল্যাণী!

আগুনের মত উজ্জ্বল উত্তপ্ত দৃঢ় মুষ্টির ভিতর একখানি নরম শ্যামল করপল্লব আশ্রয় পেলো।···হিমশীতল ক'টি আঙুলের ডগা···উত্তেজনায় থর থর। কাটলো কয়েকটি মুহূর্ত।

—প্রণাম করা হয়নি তোমায়—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করে মুখ তুলে চাইলো কল্যাণী কাঁচের মত স্বচ্ছ বড় বড় দুটি চোখ মেলে।

—কল্যাণী! আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে তুমি?

—অপেক্ষা কোথায় করলাম? তুমি আসবার আগেই তো তোমার ঘর সংসার ছেলে সব দখল করে বসে আছি। ভারী বেহায়া না?

বলিষ্ঠ দুই বাহুর মধ্যে আশ্রয় পেলো শুধু একখানি হাত নয়—সমস্ত মানুষটা!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব বেহায়া হয়েছো—খুব দুষ্টু হয়েছো। অনেক শাস্তি পাওনা আছে তোমার। এতদিন এত কষ্ট দেওয়ার শাস্তি—

—আমায় মাপ করো!·· মৃদুকণ্ঠ যেন বাতাসের নীচে রয়েছে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে কুণ্ঠিত হচ্ছে।

—মাপ করবো? বিভূতি ওর মাথার ওপর নামিয়ে আনেন নিজের মুখ—মাপ করবো তোমায়? এতোদিন ধরে শুধু নিজেকে মাপছিলাম। মেপে দেখছিলাম নিজের বোকামী, নিজের অহঙ্কার!

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ তুলে কল্যাণী বলে—আমি কিন্তু তোমার অপেক্ষা না করেই নিখিলের বিয়ের ঠিক করে ফেলেছি। রাগ করবে না তো?

—করবো না? করবোই তো! আমার ছেলেটিকে বেদখল করে নিয়েছো!

—ঠাট্টা করছো? দেখো, ও তোমার চাইতে আমাকে বেশী ভালবাসে।

—তোমাকে ভাল না বেসে উপায় কোথা কল্যাণী ?

—বাজে কথা! মিষ্টি একটু হাসলো কল্যাণী।

—কল্যাণী!

—কি ?

—চলো নিখিলের বিয়ে দিয়ে আমরা একবার যাই, আমাদের বাসরঘরে।

অস্ফুট একটি স্বর—কোথায় ?

—শালবনীর কাছারীবাড়ীতে। যেখানে তোমাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। যেখানে অহরহ তোমায় খুঁজেছি। আবার সেইখানে গিয়েই খুঁজে নেব তোমায়।

সূর্য্যমুখী ফুলের মতো উর্দ্ধমুখী হয়ে ওঠে সেই দুটি কালো চোখ। কাঁচের মতো উজ্জ্বল নয়, অভিমানের বাষ্পে আচ্ছন্ন।

—তুমি তো আমাকে খোঁজনি ?

—খুঁজেছি কল্যাণী, খুঁজেছি! প্রতিটি মুহূর্ত্তে তোমাকে খুঁজেছি, ভিতরে বাইরে। তীর্থভ্রমণ—সে তো শুধু আত্মপ্রতারণা!

কাটলো কয়েকটি মুহূর্ত্ত। অনির্ব্বচনীয় মুহূর্ত্ত ক'টি।

এই অনির্ব্বচনীয় মুহূর্ত্ত ক'টি স্থির হয়ে থাকতে পারেনা অনন্তকালের গায়ে ?

নীচে নিখিলের সাড়া পাওয়া গেল। উচ্চ কণ্ঠ।

—ত্রৈলোক্য ? ত্রৈলোক্য ? বাবা ওপরে না কি ?

ত্রৈলোক্যের সাড়া পাওয়া যায় না, নিজেই সে সিঁড়িতে উঠে আসে সশব্দ পদক্ষেপে। ত্রৈলোক্যকে ডাকাটা ছল, সাড়াটাই উদ্দেশ্য।

কে জানে, সৃষ্টিছাড়া কল্যাণী নিখিলের অনেক তদ্বির আর যত্নে পাকানো ঘুঁটিটাকে কাঁচিয়ে বসে আছে কি না!

বলাকা দেবীকে আবার আমরা দেখতে পেলাম নিখিলের বিবাহ উৎসবে। বিভূতিবাবু নিজে নিখিলের সঙ্গে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন।

ওঁকে যে একদিন নিজের বাড়ী থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে গ্লানিটা মনে পড়ে মনকে নাড়া দিয়েছিলো।…নাঃ কোনো গ্লানি আর রাখবেন না জীবনে। সকলকে সহ্য করবার, সকলকে গ্রহণ করবার, সবাইকে ভালোবাসবার ক্ষমতা জন্মেছে আজ বিভূতিভূষণের।

হ্যাঁ, বলাকা দেবীকে ক্ষমা করতেও আর বাধা আসছে না, বরং সমাদর দেখিয়ে নিমন্ত্রণ করে এনে পূর্ব্ব রূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন।

নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে মৃদুহেসে বললেন—এটা তো বিয়ের নেমন্তন্ন, আর বেড়াতে যাওয়ার নেমন্তন্নটা কবে রাখছেন বলুন?

বলাকা দেবী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

—বলছি শালবনীতে চলুননা আর একবার? বাড়ীর গৃহিণীর অনুপস্থিতিতে কেবল অসুবিধেই পেয়ে এসেছেন সেবার, সে ত্রুটীর পূরণ হোক।

অতঃপর আর বলাকা দেবীরও মনে দ্বিধা থাকে না। বিয়ে বাড়ী যাবার জন্যে নতুন এক সেট্ পোশাক করিয়ে ফেলেন!

কিন্তু এ বাড়ীতে কি বলাকা দেবীকে মানায়?

গাড়ী থেকে নামতে না নামতে তাঁকে একেবারে ঠেলে তুলে দিয়ে গেলো অন্তঃপুরের এলাকায়, যেন বলাকা দেবীও নিখিলের মেদিনীপুরী মাসী-পিসির মতো পর্দ্দানসীনা!

দেখলে হাসি পায়। গায়ে তালতাল সোনা চাপালেই যদি বাহার হতো!

এদেরও দেখোনা! এদিকে খরচও তো করেছে বিস্তর, কিন্তু কিছুরই সৌষ্ঠব নেই। যাদের প্রকৃতি এতো গ্রাম্য, ভগবান কেনই যে তাদের এতো পয়সা দিয়েছেন! বেনাবনে মুক্তোছড়ানো আর কাকে বলে?

বলাকা দেবীকে স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াতে দেখেই বোধ করি একটি বর্ষিয়সী মহিলা এগিয়ে এসে বলেন—কাকে খুঁজছো মা?

বলাকা দেবী সম্বোধনের ধরণে মুচকি হেসে বলেন—নিখিল কোথায় বলতে পারেন? নিখিল, মানে এই বিয়ের বর?

—ওমা, শোনো কথা, নিখিলকে বুঝতে পারবো না! নিখিল আমার নাতি হয় যে! বিভূতি আমার আপন ভাসুরপো! তা সে কোথায় বাইরে বাইরে আছে। কতো লোকজন আসছে, তাদের মান্যিমান্য করা কি একা বিভূতি সামলাতে পারে?

—আহা বেচারা বর!—বলাকা দেবী ব্যঙ্গ হাস্যে বলেন—আজকের দিনেও তার ডিউটি!...কিন্তু ওই যে—কি বললেন 'মান্যিমান্য' না কি, ওটা বুঝি কেবল বাইরের জন্যে? ভদ্রমহিলাদের ভাগে কিছুই পড়বে না?

বর্ষিয়সী মহিলাটি আর যাই হোন অবোধ নন। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—ওমা সে কি কথা? নিমন্ত্রি সবাই সমান আদরের। কতো ভাগ্যে মানুষের পায়ের ধুলো বাড়ীতে পড়ে! তা' এদিকে মেয়েমহলে আর আদর অভ্যর্থনা করতে সে নিজে আসবে কি? নতুন বৌমাই সব দেখছেন, যেন চরকী-পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। সোজা তো নয়, এই রাজসূয় যজ্ঞি—তা'র মাথায়!

বলাকা দেবী অবাক হয়ে বলেন—নতুন বৌ এইসব করছে? তা সে তো শুনেছি নেহাৎ বাচ্চা? এতো সব পারছে?

ভদ্রমহিলা বলাকার অজ্ঞতায় হেসে ফেলে বলেন—আ আমার কপাল!

তুমি বুঝি কাউকে চেনোনা ? তা' তোমার সঙ্গে এদের সুবাদটা কি ? কি সুবাদে এসেছো ?

অপমানাহত বলাকা দেবী বলেন—বিনা সুবাদে যেচে আসিনি আমি। বিভূতিবাবু নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এনেছেন।

বিভূতিবাবুর খুড়িটি একটু বেশী বাক্যবাগীশ বটে—তবে এহেন উত্তরে তিনি অভ্যস্ত নন। তাই তাড়াতাড়ি বলেন—ওমা সে কি কথা ? আমরা বাছা পাড়া গাঁয়ের লোক, কি বলতে কি বলে ফেলি, তা' কিছু মনে কোর না মা। আমি বিভূতির এ পক্ষের বৌয়ের কথা বলছি।···ওই যে—অ নতুন বৌমা, এই দেখো বাছা, কে নিখিলকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।··· আহা এমন গুণের বৌ হয় না। আমাদের সন্নিসী ছেলেকে ঘরবাসী করেছে।···এই যে এসো বৌমা—

টুকটুকে লালপাড় দুধে গরদের শাড়ী পরণে লম্বা ছিপছিপে উজ্জ্বল শ্যাম যে মানুষটি কাছে এসে দুই হাত তুলে নমস্কার করে শান্তহাস্যে বলে—আমি বোধ হয় মিসেস চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলাম, তাকে দেখে হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে যান বলাকা দেবী।

এই কল্যাণী !

বহুবার বহুরূপে কল্পনা করেছেন, কিন্তু ঠিক এরকমটি তো করেননি কখনো ! নিজেকে কেমন যেন এর মাঝে নিষ্প্রভ মনে হয়।

তবু সামলে নিয়ে বলেন—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কে জানে ! আপনিই বোধ হয় সেই বিখ্যাত কল্যাণী দেবী ?

—বিখ্যাত ? কল্যাণী হাসলো—তা' বলতেও পারেন। যে কোনো রকমে বিখ্যাত হওয়া নিয়ে কথা !···আমার বুদ্ধিমান ছেলেটির গুণে বিখ্যাত না হয়ে উপায়ও রইলো না।···চলুন বসবেন।

অকারণ একটা ঈর্ষার জ্বালা যেন কোথায় কামড় দিতে থাকে।

কিসের এই জ্বালা ?

বিভূতিবাবুর পাশে ওকে যতোটা বেমানান করে ভেবে রেখেছিলেন, ঠিক ততোটা বেমানান মনে হচ্ছে না বলে ?

বললেন—নাঃ, বসবো না, আরও দুটো এন্‌গেজমেণ্ট আছে! বলবেন নিখিলকে—আমি এসেছিলাম।

জুতোর খুট খুট শব্দ তুলে চলে যান বলাকা দেবী। আর দাঁড়ানোর মানে হয় না!

আর কোন রকমেই নিজেকে দৃশ্যমান করে তুলতে না পেরে, ভীড়ের সংস্রব বাঁচিয়ে, অথচ ভীড়ের লক্ষ্যগোচর হবার উদ্দেশ্যে কাঁচের গ্লাসে একগ্লাস সরবৎ খাচ্ছিলেন। হায়! কেউ তাকায় না, বোঝেই না যে এখানে উপস্থিত সকলের চাইতে কতো বেশী স্মার্ট আর কতো বেশী কালচার্ড বলাকা দেবী!...

ডাক্তার আসবে না এখানে ?

অত ভাব এদের সঙ্গে!

হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে গেলো স্বামীর সঙ্গে!...কী আশ্চর্য্য, উনিও এসেছেন! ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ভদ্রলোকের মতো!

নিখিলের ভাগ্য ভালো।

না, স্বামীকে কোনোদিন কোথাও নেমন্তন্ন যেতে দেখেন নি বলাকা দেবী।

এই তো দিব্যি ভদ্রলোকের মতো দেখাচ্ছে!

এরকম ভব্যিযুক্ত হয়ে থাকলে কি আর বলাকার মেজাজ অতো খারাপ হয়ে থাকে ?

প্রফেসর সাশ্চর্য্যে বলেন—একি এখানে একা দাঁড়িয়ে যে? ভেতরে যাওনি?

—গিয়েছিলাম—বলাকা দেবী ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন—চলে এলাম। যতো সব গাঁইয়ার দল, ওদের সঙ্গে আমার পোষায়?

প্রফেসর মৃদুহেসে বলেন—যাক এতোদিনে বুঝেছো ত'হলে, এই হতভাগ্যটি ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই পোষায় না তোমার। অতএব চলো স্বস্থানে ফেরা যাক।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তাটা ছেড়ে সাইকেল রিকসাখানা 'সেবাশ্রমে'র সুরকি ফেলা লাল রাস্তায় পড়তেই প্রায় চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন ডাক্তার।

—কি রে তোরা এখানে কেন? অমূল্য, হরিহর, অনুকুল, পঞ্চুর মা, নিতাইচাঁদ সদলবলে এখানে বসে জটলা করছিস যে? ব্যাপার কি?

—আঁগ্যে ডাগ্তারবাবু আপনি আসবেন বলে বটে।

পায়ের ধূলো নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়…যেন দেবদর্শন প্রত্যাশী যাত্রীর দল দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে মন্দিরের দরজা খোলা পেয়েছে।

—হয়েছে হয়েছে বাবা, রোস্, জুতো দুটো খুলে দিই—একমণ ধূলো পাবি, যত ইচ্ছে মাথায় মাখ।…তা'পর আছিস কেমন?

কোলাহলের মাঝখানে গোটা কয়েক কথা শোনা যায়…আছি আর কই ডাগ্তারবাবু, মরে আছি—আপুনি ছিলে না, কী দুগ্গতি গেছে আমাদের—

—বটে বটে! তা' গোটাকতক কোন্ পটল তুললি? আমি কত আশা করে আছি—আমার খাটুনী কিছু কমিয়ে রেখেছিস। হরি বল, ব্যাটাদের কাঠবেড়ালীর প্রাণ, মরবার নাম নেই! আমার কাজ বাড়াতে সব কটা টিঁকে আছিস এখনো?

আকর্ণ দন্তবিকাশ করে অনুকুল বলে—টিঁকে আছি মাত্তর!

—এইবার মরবি কেমন? বেরো বেরো চক্ষুশূলগুলো! এতদিন পরে এলাম—কোথায় একটু হাত পা ছড়িয়ে বাঁচবো, তা' না আগে থেকে ওৎ পেতে বসে আছে। বল ব্যাটা বল, তোদের রোগের ফিরিস্তি। কে "মরে যাচ্ছিলি", কার "পেরাণটা বেইরে যাচ্ছিলো", কার "দেহের মধ্যে জীবনটা আর থাকছিল না"—বল্, সব শুনে আমার পেরাণটা শীতল করি।

—আমরা চিকিচ্ছে করাতে আসিনি আঁগ্যে। আপনারে দেখবার লেগে এইছি বটে।

—'বটে'? এবার থেকে তোরাই আমাকে দেখবি তা'হলে? বেশ বেশ, খুব লায়েক হয়েছিস যে! কিন্তু নিতাইচাঁদ, পীলেটা যে তোর পেটের চামড়ার মধ্যে আর থাকতে রাজী হচ্ছেনা দেখছি! করে তুলেছিস কি বাপ?

—আপুনি চলে গেলেন আঁগ্যে, আমরাও গেলাম। বলবো সব—হাতে মুখে জল দিন আঁগ্যে।

—উঁহু, রিপোর্ট না নিয়ে জলগ্রহণ করছি না। কলকাতা থেকে মোক্ষম ওষুধ নিয়ে এসেছি—বোতল বোতল বুঝলি? একটি একটি ফোঁটা—ব্যস।···পীলে লিভার নাড়ি ভুঁড়ি সব সুদ্ধু লোপাট একেবারে!···অনুকুল তোর চোখ দুটো ড্যাব্ ড্যাব্ করছে কেনরে? জ্বর এসেছে বুঝি? দেখি হাতটা?

লাল ধুলোর রাস্তায়···একখানা ভাঙা ইটের ওপর উবু হয়ে বসে পড়েন ···প্লীহাগ্রস্থ জরাজীর্ণ ক'টি মানবসন্তানের মাঝখানে।···এই পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে বসে পড়ে চারিদিকে তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে যান ডাক্তার।···এদের ত্যাগ করে এতদিন ছিলেন কোথায়?